সর্বাধিক প্রচারিত শিশু-কিশোর মাসিক

নতুন কিশোর কণ্ঠ

জুলাই ২০২০

লক্ষ বছর পর ফিরে এলো যে পাখি

কুয়ালালামপুর থেকে পচেফস্ট্রুম

প্রাণ ফিরুক মাঠে

ক্লাস এবং মিটিং এখন জুম অ্যাপে

রঙের সাথে মনের ভাব

সম্পূর্ণ উপন্যাস : উরুমকির কান্না

নদীমাতৃক বাংলাদেশে বর্ষাই হলো প্রাণ

ভর্তি চলছে...

১ম

২য়

৩য়

আইরিন

অর্ণব

সজীব

অবিস্মরণীয় সাফল্যগাথা

প্রথম ১০ জনে ০৯ জন

DMC তে ১৭৪ জন সহ

সর্বমোট চান্সপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী ২৯৬৫ জন

রেটিনা

০১৮১৬ ৭৮১৭৭১-৬

ইবনে সিনা আমলা

মেডিকেটেড হারবাল হেয়ার অয়েল

চুল পড়া ও খুশকির হারবাল সমাধান

একটি ইবনে সিনা পণ্য

হারবাল উপাদান সমৃদ্ধ

তাই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মুক্ত

- চুল পড়া বন্ধ করে
- খুশকি দূর করে
- মাথা ঠান্ডা রাখে
- সুনিদ্রা আনয়ন করে
- চুলের অকাল পক্কতা রোধ করে
- নিয়মিত ব্যবহারে নতুন চুল গজায়
- চুলকে করে ঘন কালো, মজবুত ও স্বাস্থোজ্জ্বল

IBN SINA

ন্যাচারাল মেডিসিন ডিভিশন

দি ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি লিঃ

তানিন সেন্টার, ৩ আসাদগেট, মিরপুর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

সর্বাধিক প্রচারিত শিশু-কিশোর মাসিক

নতুন কিশোরকণ্ঠ

বর্ষ ১৭ ■ সংখ্যা ৫

জুলাই ২০২০
শ্রাবণ ১৪২৭
জিলক্বদ ১৪৪১

সম্পাদক
মোশাররফ হোসেন খান

নির্বাহী সম্পাদক
রাজিবুর রহমান

সহকারী সম্পাদক
তোফাজ্জল হোসাইন
আবিদ হাসান

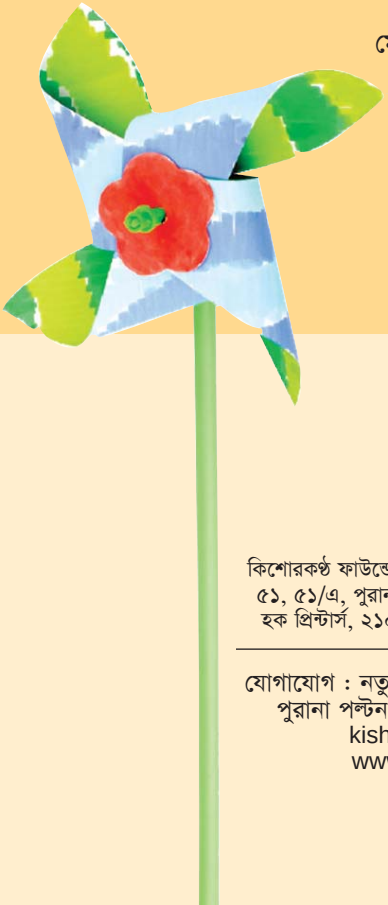

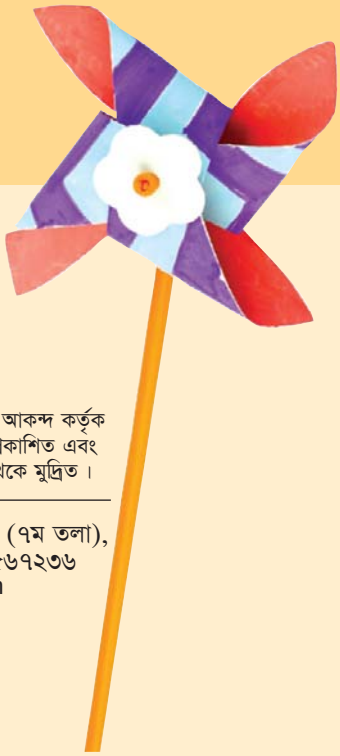

দাম ২০ টাকা

কিশোরকণ্ঠ ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে মতিউর রহমান আকন্দ কর্তৃক ৫১, ৫১/এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত এবং হক প্রিন্টার্স, ২১০ ফকিরাপুল, মতিঝিল ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

যোগাযোগ : নতুন কিশোরকণ্ঠ, ৫১, ৫১/এ (৭ম তলা), পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৫৬৭২৩৬
kishorkantha@yahoo.com
www.kishorkanthabd.com

পুনর্জীবন

কুরআন পড়তে পড়তে এক জায়গায় এসে থেমে গেল মাহবুব। থামতেই হলো তাকে। দু'টি আয়াত অতিক্রম করে সামনে যেতে পারছে না কোনোভাবেই। বারবার পড়ছে তো পড়ছেই! তার শরীর শিউরে উঠছে। আর ভাবছে, মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতার কথা। ভাবছে, কিভাবে তিনি মৃতকে জীবিত করবেন, সেই অকল্পনীয় দৃশ্য!

আয়াতগুলো নিয়ে রীতিমতো গবেষণা শুরু করে দিয়েছে মাহবুব। খুলে বসেছে পারিবারিক পাঠাগার থেকে কয়েকটি তাফসিরের কিতাব! প্রথম আয়াতটি হলো–

"অথবা সেই ব্যক্তির কথা ভেবে দেখনি? যে এমন এক নগরে উপনীত হয়েছিল, যা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। সে বলল, 'মৃত্যুর পর কিভাবে আল্লাহ এ নগর জীবিত করবেন?' তখন তাকে আল্লাহ এক শ' বছর মৃত রাখলেন, তারপর তাকে পুনর্জীবিত করলেন। আল্লাহ বললেন, 'তুমি (মৃত অবস্থায়) কতক্ষণ ছিলে?' সে বলল, 'একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ!' তিনি বললেন, 'বরং তুমি এক শ' বছর ছিলে! অথচ তোমার খাদ্যসামগ্রী ও পানীয় বস্তুর প্রতি লক্ষ কর, তা অবিকৃত রয়েছে। আর তুমি তোমার গাধাটির প্রতি লক্ষ কর (যার হাড়গোড় পড়ে আছে)। আমি তোমাকে মানবজাতির জন্য নিদর্শনস্বরূপ করব। আর (গাধার) অস্থিগুলো লক্ষ কর, কিভাবে সেগুলোকে আমি সংযোজিত করি, অতঃপর গোশত দিয়ে ঢেকে দেই।' সুতরাং যখন এটি তার কাছে সুস্পষ্ট হলো, তখন সে বলে উঠল, 'আমি জানি যে, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাশক্তিমান।"

এর পরের আয়াতেই আছে– "আর (স্মরণ কর) যখন ইবরাহিম বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর, আমাকে দেখাও।' তিনি বললেন, 'তুমি কি তাহলে বিশ্বাস কর না?' সে বলল, 'অবশ্যই (বিশ্বাস করি)। কিন্তু আমার মনকে পরিতৃপ্ত করার জন্য (দেখতে চাই)!' তিনি বললেন, 'তবে চারটি পাখি ধরো এবং (পুষে) তোমার বশীভূত কর। (জবাই করার পর টুকরো টুকরো করে একসাথে মেশাও)। তারপর তাদের এক এক অংশ এক এক পাহাড়ে রেখে এসো। অতঃপর তাদের ডাক দাও। (দেখবে,) ওরা দ্রুতগতিতে তোমার কাছে এসে উপস্থিত হবে। আর জেনে রাখো, আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আল বাকারাহ : ২৫৯-২৬০)

অশ্রুভেজা চোখে মাহবুব বলতে লাগল, দয়াময়! জানি, মাটিতে মিশে গেলে এভাবেই তুমি জাগিয়ে তুলবে আমাদের। তবে সে জাগরণ যেন হয় সুখের! জান্নাতপ্রাপ্তির আনন্দের!

– বিলাল হোসাইন নূরী

বিতর্ক

যেখানেই বিতর্ক প্রতিযোগিতা, সাফওয়ান সেখানেই উপস্থিত। বিতর্ক তার খুব প্রিয় একটি বিষয়। তার বইয়ের আলমারিতে বিতর্কের ওপর লেখা কত কত বই আছে, হিসাব নেই! বড় হয়ে সে অনেক বড় বিতার্কিক হতে চায়! যুক্তির সৌন্দর্যে করতে চায় বিশ্বজয়!

তার বিদ্যালয়ের নিয়মিত আয়োজনের অংশ হিসেবে আজও বসেছে বিতর্কের আসর! এতে সে-ও একজন প্রতিযোগী। কঠিন আত্মবিশ্বাসী।

শুরুতেই, প্রতিযোগীদের উদ্দেশে কিছু কথা বলতে দাঁড়ালেন তাদের প্রিয় প্রধান শিক্ষক। তিনি বললেন, বিতর্ক এক দারুণ শিল্প। তাই, এর শিল্পমান ধরে রাখা আমাদের দায়িত্ব। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "আর তাদের সাথে বিতর্ক করো উত্তমভাবে!" (সূরা নাহল : ১২৫)

এরপর স্যার বললেন, কিভাবে যুক্তি তুলে ধরতে হয় যৌক্তিকভাবে! উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরলেন, হজরত আদম ও মূসা (আ)-এর কথা! হজরত আদম ও মূসা (আ) বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। মূসা (আ) বলেন, হে আদম! আপনি তো আমাদের পিতা। আপনি আমাদের বঞ্চিত করেছেন এবং জান্নাত থেকে বের করেছেন। হজরত আদম (আ) মূসা (আ)কে বললেন, হে মূসা! আপনাকে তো আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কালামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন এবং আপনার জন্য স্বীয় হাত দিয়ে লিখেছেন। অতএব আপনি কি আমাকে এমন একটি ব্যাপার নিয়ে তিরস্কার করছেন, যা আমার সৃষ্টির ৪০ বছর পূর্বেই আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখেছেন? তখন আদম (আ) মূসা (আ)-এর ওপর এই বিতর্কে জয়ী হলেন। উক্ত কথাটি রাসূল (সা) তিনবার বলেছেন। (মুসলিম)।

স্যার বললেন, দেখেছো কিভাবে যুক্তি দিতে হয়?

তবে বিতর্কের উভয় দলকেই জ্ঞানী হতে হয়। তা না হলে, একে অপরের সম্মান রক্ষা করতে পারে না। এ কারণেই, আল্লাহ তায়ালা অজ্ঞদের সাথে কথা বলতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন– 'আর মূর্খরা যখন কথা বলে, তখন (মু'মিনরা বলে), সালাম!' (সূরা ফুরকান : ৬৩)। অর্থাৎ, তোমাদের সাথে আমরা বিতর্ক করতে চাই না।

সাফওয়ান নতুন অনেক কিছু শিখল আজ। ভাবল, হ্যাঁ! বিতর্ক তো এমনই হওয়া উচিত। শুধু প্রতিযোগিতা কেন, আমাদের প্রতিটি কথাই হওয়া উচিত যৌক্তিক। সুন্দর।

– বিলাল হোসাইন নূরী

নদীমাতৃক বাংলাদেশে বর্ষাই হলো প্রাণ

মামুন মাহফুজ ১২

লক্ষ বছর পর ফিরে এলো যে পাখি

৬৮

ধারাবাহিক উপন্যাস

উরুমকির কান্না

আহমদ মতিউর রহমান ২৮

ছড়া-কবিতা

মোশাররফ হোসেন খান ৯
এ কে আজাদ ২৪
ছন্দা দাশ ১১
হাসান রুহুল ৪৪
আজাদ শেখ ৪৮
তোফায়েল প্রধান ৫৫

গল্প

বাঘ শিকারে একদিন : জাফর তালুকদার ২৫
অন্য গ্রহের মানুষ : দেলোয়ার হোসেন ৪৯

বিশেষ রচনা

কুয়ালালামপুর থেকে পচেফস্ট্রুম
আহমেদ বায়েজীদ ৪৫

দেশ-মহাদেশ

দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম দেশ ব্রাজিল
মুহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম ৫৬

চিত্র বিচিত্র

জাহিদ ইকবাল ৬৮

খেলার চমক

প্রাণ ফিরুক মাঠে : আবু আবদুল্লাহ ৭৬

আইটি কর্নার

ক্লাস এবং মিটিং এখন জুম অ্যাপে
শরীফ তাজওয়ার ৮৫

বিজ্ঞান ও বিশ্ব

রঙের সাথে মনের ভাব : আল জাবির ৮৮

তোমাদের গল্প

দাদুর উপদেশ : সিফাত হোসেন ৬৬
খলিল স্যারের স্মৃতি : মাহাথির আরাফাত ৭৩
পিশাচ কাহিনী : গোলাম রাব্বি রাকিব ৮১

তোমাদের ছড়া-কবিতা

ফরিদ আহমেদ ফরায়েজী, আলী ওয়াজেদ ৭২
মুহাম্মদ ইমদাদ হোসেন, আহমদ হোসাইন জসিম ৮০
ফরিদ সাইদ, আনিকা তাবাসসুম তাসফিয়া ৮৪
জাহাঙ্গীর আলম, আব্দুল্লাহ শাহজাহান ৮৭
ছামির আলী ভূঁইয়া, আলামিন ইসলাম জীবন ৯৪

কুরআনের আলো ২, হাদিসের আলো ৩, আমাদের কথা ৫, ঝাঁপি থেকে ৭
হাসির বাকসো ১০, অনুশীলন ২২, শব্দধাঁধা ২২, বলতে পারো ২৩

আমাদের কথা

প্রাণপ্রিয় বন্ধুরা,
আসসালামু আলাইকুম।
আশা করি সবাই ভালো এবং সুস্থ আছ।
জ্যৈষ্ঠের দাবদাহ ছাড়িয়ে এখন আষাঢ়ের গুরুগম্ভীর আওয়াজ কানে ভেসে আসছে। এ সময় যখন তখন বৃষ্টি! কখনোবা মুষলধারে। বাইরে বের হওয়া কষ্টকর হয়ে যায়। তারপরও কিন্তু আষাঢ়ের মজাটাই আলাদা! বাইরেও নামা যায় না, আবার ঘরেও বসে থাকতে ইচ্ছে করে না। মন ছুটে যেতে চায় বৃষ্টির মধ্যে মাঠ-ঘাট আর পুকুরপাড়ে।
সত্যিই তাই। আষাঢ়ের বাদল দিনে কারইবা ঘরে বসে থাকতে ইচ্ছা করে! মনটা ছুটে যেতে চায় দূর-দিগন্তে, ভেজা ঘাসফুল আর ফসলের গন্ধ শুঁকতে। আষাঢ় তো এমনি। আমাদের মনকে উদাস করে তোলে। হৃদয়টা ভিজিয়ে দিয়ে যায়। আর ভাবনার জগতে ছুটে চলে স্বপ্নের পাখিরা।
আষাঢ় এলেই আষাঢ়ে গল্পের পেছনে কখনোবা ছুটতে ইচ্ছে হয়। আবার কখনোবা রিমঝিম বৃষ্টির গন্ধে মন টেনে নিয়ে যেতে চায় শাপলা ফোটা বিল কিংবা খালের ধারে। কিন্তু সাবধান! মন চাইলেও অসতর্ক হওয়া যাবে না। একটু অসতর্ক হলেই নেমে আসতে পারে যে কোনো ধরনের বিপদ। তাই সর্বদা সতর্কভাবে পা ফেলতে হবে। করোনার এই কালে সবাই সতর্ক থেকো, নিরাপদে থেকো।
আজ এই পর্যন্তই!
আল্লাহ হাফিজ।

ইবনে সিনা আমলা

মেডিকেটেড হারবাল হেয়ার অয়েল

চুল পড়া ও খুশকির হারবাল সমাধান

একটি ইবনে সিনা পণ্য

হারবাল উপাদান সমৃদ্ধ

তাই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মুক্ত

- চুল পড়া বন্ধ করে
- খুশকি দূর করে
- মাথা ঠান্ডা রাখে
- সুনিদ্রা আনয়ন করে
- চুলের অকাল পক্কতা রোধ করে
- নিয়মিত ব্যবহারে নতুন চুল গজায়
- চুলকে করে ঘন কালো, মজবুত ও স্বাস্থোজ্জ্বল

IBN SINA

ন্যাচারাল মেডিসিন ডিভিশন

দি ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি লিঃ

তালিম সেন্টার, ৩ আসাদগেট, মিরপুর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

আমি নতুন কিশোরকণ্ঠের একজন নিয়মিত পাঠক। এখনতো বিশ্বের পরিস্থিতি ভালো নয়। এখন কি আপনাদের ঠিকানায় লেখা পাঠানো যাবে? আসলে আমি পুরনো পাঠক কিন্তু কখনো লিখিনি। আমি যদি লেখা পাঠাই সেগুলো কি এখন ছাপা হবে ?

বিবি আফসানা
মোল্লাপাড়া, সোনাইমুড়ি, নোয়াখালী

– তুমি মেইলে লেখা পাঠাও। লেখা ভালো হলে ছাপা হবে ইনশাআল্লাহ।

আমি কিশোরকণ্ঠ পত্রিকার খোলা ডাক, ঝাঁপি থেকে, বলতে পারো, শব্দধাঁধা, রংতুলি ইত্যাদি বিভাগে লেখা পাঠাতে চাই সেটা কোথায় লিখব আর কিভাবে পাঠাব জানালে উপকৃত হতাম। আর পরিশেষে জানতে চাই ২০২০ এই সালের কিশোরকণ্ঠ পাঠ প্রতিযোগিতা পরীক্ষা কবে হবে আর পরীক্ষা কিভাবে দিতে হয় জানালে খুশি হতাম।

খোকন মোজাহিদ
রংপুর সদর, রংপুর

– সকল লেখা মেইলে পাঠাতে পারো। পাঠ প্রতিযোগিতা কখন হবে সেটা সময়মতো জানানো যাবে।

কিশোরকণ্ঠ অনলাইন ওয়েবসাইটে অনুশীলন বিভাগটি চালু করলে খুবই ভালো হতো।

মো: ইয়াছিন আরাফাত
আইনুল হক ফাযিল মাদরাসা, ডিমলা, নীলফামারী

– ওয়েবসাইটে মূল পত্রিকার সাথে অনুশীলন আছে তো।

বিশেষ মূল্য ছাড়!

আপনি কী? আপনার ছেলে-মেয়েদেরকে স্বর্ণযুগের সোনালী মানুষের মতো গড়তে চান তাহলে তাদের নিয়ে গল্প আকারে রচিত বইগুলো আজই সংগ্রহ করুন।

শিশুতোষ বই ৩৫টি (১সেট) ৫০৭০ টাকা কমিশন ২৪০০ টাকা

১. যে অতীত প্রেরণা যোগায়-১ম ২য় গল্প। ২. ছোটদের বিশ্বনবী (স.)। ৩. ন্যায় বিচারের গল্প। ৪. পেতাম যদি এমন শাসক। গল্প ৫. শিশুতোষ পাঁচ পয়গম্বর- জীবনী। ৬. শিশুতোষ বাদশা সোলায়মান ৭. ফুটলো গোলাপ ইরান দেশে-জীবনী। ৮. ছোটদের হাসানুল বান্না। ৯. কুরআনের গল্প। ১০. হাদীসের গল্প। ১১. ছোটদের শেখ শাদী। ১২. মেধা বিকাশের সোপান। ১৩. কিতাবুস সালাত। ১৪. এসো কুরআন শিখি। ১৫. এসো হাদিস শিখি। ১৬. আবু বক্কর (রা.)। ১৭. ওমর (রা.)। ১৮. ওসমান (রা.)। ১৯. আলী (রা.)। ২০. খাদিজা (রা.)। ২১. আয়েশা (রা.)। ২২. ফাতেমা (রা.)। ২৩. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ২৪. আশারায়ে মুবাশশারা (রা.)। ২৫. আনাস ইবনে মালেক (রা.)। ২৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)। ২৭. আবু হোরায়রা (রা) ২৮. সালমান ফারসি (রা) ২৯. হাসান হোসাইন (রা) ৩০. সেরা মুসলিম বিজ্ঞানী। ৩১. সেরা মুসলিম মনীষী। ৩২.ওমর ইবনে আবদুল আজীজ। ৩৩. নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন। ৩৪. ভাল মানুষের গল্প।

৩৩ টি বই (১সেট) ৪৮৫০ টাকা কমিশন বাদে ২২৫০ টাকা

১. আসান ফিকাহ-১ম ও ২য় খন্ড। ২. এন্তেখাবে হাদীস-(১, ২) একত্রে। ৩. রাহে আমল-১ম ও ২য় খন্ড। ৪. যাদে রাহ্। ৫. ফিকাহ মুহাম্মদী। ৬. মাতা পিতা ও সন্তানের অধিকার। ৭. কবীরা গুনাহ। ৮. গীবত বা পরনিন্দা। ৯. সকাল সন্ধ্যার শ্রেষ্ঠ আমল। ১০. কোরআন তিলাওয়াতের ফজিলত। ১১. পর্দা কি কেন পর্দা কর না? ১২. পয়গামে মুহাম্মদী। ১৩. কেয়ামতের বিভীষিকা-১-২। ১৪. বোখারা সমরকন্দের করুণ ইতিহাস।। ১৫. আদাবে জিন্দেগী। ১৬. ইসলামী আন্দোলনের কৌশল ও কর্মসূচি। ১৭. ইসলামে সামাজিক বিধান। ১৮. বাইবেল কোরআন বিজ্ঞান। ১৯. রাসূলুল্লার (স.) বিপ্লবী জীবন। ২০. জান্নাত লাভের উপায়। ২১. আল্লাহর পথে ব্যয় ১০০আয়াত ১০০ হাদিস। ২২. আমরা দাওয়াতি কাজ কীভাবে করবো? ২৩. কুরআন হাদীস সংকলন। ২৪. আল্লাহর রাসূল যে সব দু'আ ও জিকির পড়তেন। ২৫. লোকমান আ: ১০টি উপদেশ। ২৬. বোরকা ওড়না সাজসজ্জা। ২৭. তাওবার দরজা খোলা। ২৮. লজ্জা শরমের কথা ২৯. সামাজিক কাজ। ৩০. যেসব যুদ্ধে রাসুল সা. সেনাপতি ছিলেন। ৩১. মানুষের জিঙ্গাসা আল্লাহর জবাব

উপমহাদেশে আলোড়ন সৃষ্টিকারী খন্দকার আবুল খায়ের (র.) লিখিত দারসে কুরআন সিরিজের ১-৫৬টি বই ১৬০০ টাকা

গাজী সালাহউদ্দীন আয়ূবীর দুঃসাহসী অভিযান নিয়ে রচিত ক্রুসেড সমগ্র (১,২,৩) মূল্য ২৪০০ টাকা ৫৫% কমিশনে ১০৮০ টাকা

নসীম হিজাযীও শফীউদ্দীন সরদার (ঐতিহাসিক উপন্যাস) ২০টি বই কমিশন বাদে ২৭০০ টাকা

১. সীমান্ত ঈগল। ২. মহাবীর সুলতান মাহমুদ। ৩. কায়সার কিসরা। ৪. আধার রাতের মুসাফির। ৫. শেষ বিকালের কান্না। ৬. ইউসুফ বিন তাসফীন। ৭. হেজাযের কাফেলা। ৮. কিংসায়মনের রাজত্ব। ৯. ইরান তুরান কাবার পথে। ১০. ভারত যখন ভাঙ্গল। ১১. অপরাজিত। ১২. মানুষ ও দেবতা। ১৩. মুহাম্মদ ইবনে কাসীম। ১৪. মরণ জয়ী। ১৫. ভেঙ্গে গেলো তলোয়ার। ১৬. খুনরাঙ্গা পথ। ১৭. শেষ প্রান্তর। ১৮. পথহারা পাখী। ১৯ . অপূর্ব অপেরা। ২০. এক পাহাড়ী সন্তন।

নতুন সিলেবাসের কর্মী সাহিত্য ১৮টি ৬৫০ টাকা , সাথী সাহিত্য ৩০টি= ১৬০০টাকা ,সদস্য ৭৭টি বই= ৭৫০০, রোকন সদস্য সাহিত্য ৬৮টি হাদীস ৪টি= ৪১০০ এছাড়া ও সকল ধর্মীয় বই পেতে যোগাযোগ করুন।

ইসলামী ব্যাংক
সদর ঘাট শাখা।
চলতি হিসাব-৪৯৭৫

তাকিয়া বুক ডিপো

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়

তাকিয়া বুক ডিপো

পাঠক বন্ধু মার্কেট, ৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা।
বিকাশ ঃ ০১৭৯১-৭৪৮৮৬৬, ০১৯২৪-৭৩৩৮১৫

ঢাকা ও কুরিয়ারে সারাদেশে বই পাঠানো হয়।

একটু সুখ

মোশাররফ হোসেন খান

প্রবল ঝড়েও ভাঙেনি কাকের বাসা
খুশিতে তাই ওরা আত্মহারা,
ছাদে গিয়ে দেখি অবাক কাণ্ড
ফুটে আছে অজস্র নয়ন তারা!

আহা কী অপরূপ দৃশ্য ফুলের
দেখে দেখে হৃদয় জুড়াই,
মাথার ওপরে দেখি পায়রাগুলো
মনের খুশিতে পালক ওড়ায়।

রঙবেরঙের মেঘমালা, রঙধনু আর
অজানা রহস্যে ঘেরা আকাশ,
শরীরে শিহরণ জাগানো ঝির ঝির
বৃষ্টিভেজা মুগ্ধ বাতাস।

শেষ বিকেলের এসব দৃশ্যপটেই
ক্লান্তি চলে যায় বহু দূরে,
অনেক বেদনার মাঝে একটু সুখ–
রেণুছড়া ডাকে মোহন সুরে।...

বিদ্যুৎ অফিসের সামনে চায়ের দোকানে কলা ঝুলিয়ে রেখেছে বিক্রির জন্য! বিদ্যুৎ অফিসের এক প্রকৌশলী চা খাওয়ার সময় জিজ্ঞেস করলেন কলার দাম কত?

দোকানদার : কী কাজে কলা ব্যবহার করবেন তার ওপর নির্ভর করে কলার দাম!

প্রকৌশলী : মানে কী?

দোকানদার : যদি কোন মিলাদ বা ধর্মীয় কাজে নেন তাহলে দুই টাকা পিস, যদি রোগীর জন্য নেন তাহলে ৩ টাকা পিস, আর যদি নিজে খাওয়ার জন্য নেন তবে ৫ টাকা পিস!

প্রকৌশলী : ইয়ার্কি কর, একই কলার দাম বিভিন্ন হয়?

দোকানদার : একই খুঁটি হতে বিদ্যুৎ বাসায় গেলে একদর, দোকানে গেলে আরেক দর, কারখানায় গেলে আরেক দর। তাহলে আমার কলা কী দোষ করলো?

আব্দুল বাসিত
বড়দেশ, কানাইঘাট, সিলেট

দুই পাগলের মধ্যে কথোপকথন–

১ম পাগল : বলতো রাতে সূর্য ওঠে না কেন?

২য় পাগল : দূর বোকা! রাতে তো সূর্য ঠিকই ওঠে কিন্তু অন্ধকারে আমরা তা দেখতে পাই না।

রুহুল আমিন খান
হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ

ক্লাসে শিক্ষক-ছাত্রের কথোপকথন–

শিক্ষক : গতকাল খবরে দেখলাম একজন লোক বিশ হালি ডিম খেয়েছে!

ছাত্র : স্যার! এটা তো সহজ। গতকাল আমিও কয়েক হাজার ডিম এক সাথে খেয়েছি!

শিক্ষক : বলিস কী! ঐগুলো কিসের ডিম ছিল?

ছাত্র : মাছের ডিম।

মো: মাহফুজ রুমান খান
হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ

আমিও কয়েক হাজার ডিম এক সাথে খেয়েছি!

সত্যি কথা

ছন্দা দাশ

সত্যি যেটা
বলছি সেটা
বলবে না তা
খবরদার ।
বললে পরে
ভেনিস হবে
হদিস পাওয়া
ভীষণ ভার ।

কী যেন হয়
মাসির ছেলের
নাতির নাকি
ভাইরা ভাই,
নামটা যেন
বিদঘুটে যা
কেউ কখনও
শোনেই নাই ।

সেও আবার
মজার বিষয়
শুনলে পরে
হেসেই খুন,
পানের খিলি
ভাত দিয়ে খায়
ভাতের সাথে
খায় সে চুন ।

আসল কথা
রোসো রোসো
একটু পরেই
চিচিং ফাঁক,
তার আগে দি
গরম চায়ে
নরম চুমুক
প্রাণ জুড়াক ।

কি বলি ভাই
সন্ধ্যে হল
আজকে তবে
তোলাই থাক
কাল সকালে
বলবো তবে
সত্যি যেটা
রাতটা যাক ।

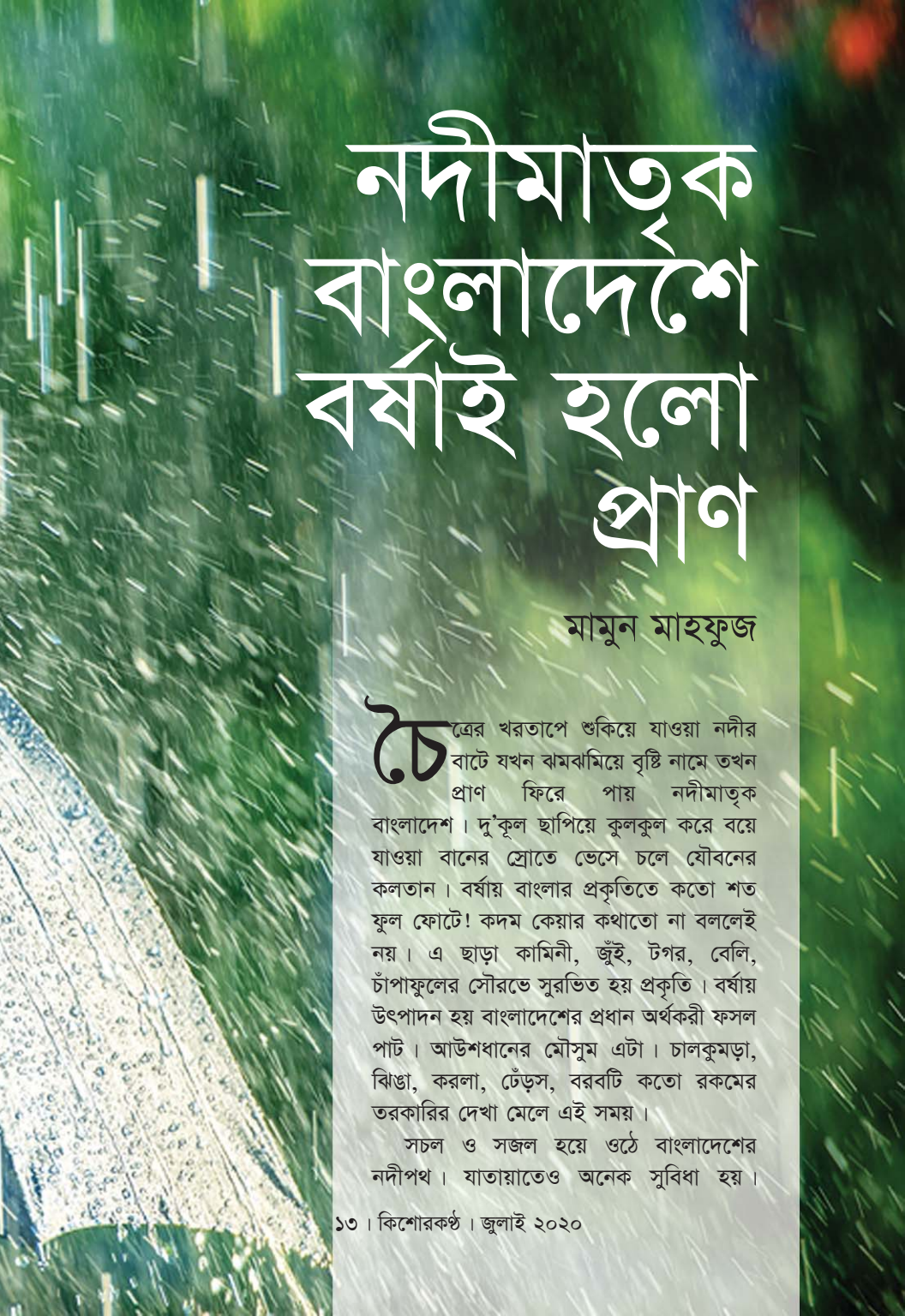

নদীমাতৃক বাংলাদেশে বর্ষাই হলো প্রাণ

মামুন মাহফুজ

চৈত্রের খরতাপে শুকিয়ে যাওয়া নদীর বাটে যখন ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে তখন প্রাণ ফিরে পায় নদীমাতৃক বাংলাদেশ। দু'কূল ছাপিয়ে কুলকুল করে বয়ে যাওয়া বানের স্রোতে ভেসে চলে যৌবনের কলতান। বর্ষায় বাংলার প্রকৃতিতে কতো শত ফুল ফোটে! কদম কেয়ার কথাতো না বললেই নয়। এ ছাড়া কামিনী, জুঁই, টগর, বেলি, চাঁপাফুলের সৌরভে সুরভিত হয় প্রকৃতি। বর্ষায় উৎপাদন হয় বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল পাট। আউশধানের মৌসুম এটা। চালকুমড়া, ঝিঙা, করলা, ঢেঁড়স, বরবটি কতো রকমের তরকারির দেখা মেলে এই সময়।

সচল ও সজল হয়ে ওঠে বাংলাদেশের নদীপথ। যাতায়াতেও অনেক সুবিধা হয়।

নৌপথে স্বল্পব্যয়ে পণ্য পরিবহন সহজ হয়।

অনেক রকমের ফল পাওয়া যায় বর্ষাকালে। আম, জাম, কাঁঠাল, আনারস, পেয়ারা, ডেউয়া, চালতা, লটকন, তাল এরকম জনপ্রিয় রস-টসটসে ফলগুলো কিন্তু বর্ষাকালে পাওয়া যায়। তাই বলাই বাহুল্য এই বর্ষা মহান রবের শ্রেষ্ঠ দান।

'আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে থাকি পরিমাণ মতো। অতঃপর আমি জমিনে সংরক্ষণ করি এবং আমি তা অপসারণও করতে সক্ষম। অতঃপর আমি তা দিয়ে তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করেছি। তোমাদের জন্য এতে প্রচুর ফল আছে এবং তোমরা তা থেকে আহার করে থাক। এবং ঐ বৃক্ষ সৃষ্টি করেছি, যা সিনাই পর্বতে জন্মায় এবং আহারকারীদের জন্য তৈল ও তরকারি উৎপন্ন করে।' (সূরা মুমিনুন : আয়াত ১৮-২০)

এ থেকে আমরা জানতে পারি বৃষ্টি হলো আমাদের রিজিকের অন্যতম উৎস। জমিনে বৃষ্টিপাত হয়, তার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন হয়। আর সেই ফসলাদি খেয়ে আমরা বেঁচে থাকি।

এ ছাড়াও কিন্তু বর্ষার অনেক রূপময় দিক আছে, যা শিশু কিশোর, যুবা কিংবা বৃদ্ধ সব বয়সের মানুষকেই আকৃষ্ট করে, আন্দোলিত করে।

কবির ভাষায়–

বৃষ্টি মানে হারানো এক আকাশ খুঁজে পাওয়া
ধন্য জীবন, ধন্য মাগো জন্ম কবি বেশে
আমরা সবাই কদম গাছে আষাঢ় ফোটা নদী
ভেজা শালিক, জন্ম নেব আবারও এই দেশে।

বাংলা ভাষার শক্তিমান কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কবিতা চর্চা হয়েছে বলা যায় বর্ষা আর বসন্ত নিয়ে। বর্ষা তাই শুধু প্রকৃতির প্রাণময় ঋতুই নয় বরং মানুষ ও প্রাণিজগতেরও প্রাণ।

"ঝম ঝমা ঝম বৃষ্টি পড়ে, গাঁয়ে ঢোকে জল,
বাসায় ভিজে পাখিরা সব, করছে কোলাহল।
বৃষ্টি পড়ে মুষলধারে,
মেঘ জমেছে আকাশপারে,
সকাল বিকাল অঝোর ধারায়, বৃষ্টি ঝরে অবিরল,
সকাল হতে আজিকে দেখি, নেমেছে বৃষ্টি বাদল।"

বৃষ্টিবাদল দিনে শিশু-কিশোরের দলও যেন গাঁয়ের উপচেপড়া পুকুরের জল। কিছুতেই বাঁধ মানে না। শোনে না মানা বাবা-মার। কেউ ফুটবল হাতে, কেউ মাছধরার পোলো হাতে, কেউবা ক্রিকেটের ব্যাট হাতে নিয়ে চুপটি করে বেরিয়ে পড়ে ঘর থেকে। জালহাতে কিশোরের দল বিলে-ঝিলে চলে যায় মাছ ধরতে। তারপর সারাবেলা নিখোঁজ থেকে কাচমাচু করে ভিজে চুপচুপ কিংবা কাদামাখামাখি করে ফিরে আসে ঘরে। যদিও সন্তানদের ফিরে আসায় চোখে আনন্দের ঝিলিক খেলা করে বাবা-মার, কিন্তু কপট রাগের ধমকে চাপা দিয়ে বলে- 'যা এক্ষুনি, পরিষ্কার হয়ে গরম কাপড় পর। ঠাণ্ডা লাগলে খবর আছে।'

কে শোনে কার বারণ! শিশুরা উঠোনবাড়িতে কিংবা শহুরে বাড়িগুলোর ছাদে নাচানাচি করে। ব্যাঙ ডাকে সারারাত। এই প্রাণ-মাতানো দৃশ্য মেলে বর্ষায়। তাই বর্ষা নিয়ে কবিদের নিরন্তর ব্যস্ততা, কাব্যকথা।

"সকাল হতেই নেমেছে বৃষ্টি, আজকে সারাবেলা,
আকাশ জুড়ে কালো মেঘের, লুকোচুরি খেলা।
বৃষ্টির ধারা ঝরিছে অঝোরে,
নদী খেত মাঠ, জলে আছে ভরে,
বেড়ার ধারে, রাঙিগাই এক, বৃষ্টিতে ভিজে একেলা।
বাছুরীর কাছে নিয়ে এসো তারে, নিয়ে এসো এই বেলা।"

কী চমৎকার বর্ষা-দৃশ্য এঁকেছেন কবি। ছবির মতো সাজানো যেন। আকাশে কালো মেঘ, বৃষ্টির ফোঁটা, নদীর টইটম্বুর অবস্থা, খেত উপচানো বৃষ্টির ধারা, বাড়ির আঙ্গিনায় গাভীটি বাঁধা। চোখ বুজেও যেন দৃশ্যটি ভেসে ওঠে মানসপটে।

ছোটবেলায় আমাদের সবারই যে ছড়াটি মনের গহিনে গাঁথা ছিল সেটি হলো–

"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
নদেয় এলো বান"

কিন্তু কে লিখেছে এই ছড়া? অথচ আমাদের মা-খালাদের কণ্ঠে কণ্ঠে আজ অবধি এসে পৌঁছেছে সেই ছড়াগানটি। আমরা যেমন আমাদের ছোটবেলায় শুনেছি, তেমনি আমাদের মা-খালা দাদী-নানীরাও শুনেছেন তাদের ছোটবেলায়। এভাবে কত যুগ আগে যে এই ছড়ার সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়েছে কে জানে?

"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
নদেয় এলো বান"

শিব ঠাকুরের বিয়ে হবে
তিন কন্যে দান।

এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন
এক কন্যে খান
আরেক কন্যে গোস্বা করে
বাপের বাড়ি যান।"

কবি রবীন্দ্রনাথও নিশ্চয়ই ছড়াটি তার ছোটবেলায় শুনেছেন। তিনি নিজেও এ নিয়ে কবিতা লিখেছেন।

"দিনের আলো নিবে এল সুয্যি ডোবে ডোবে।
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে চাঁদের লোভে লোভে।
মেঘের উপর মেঘ করেছে, রঙের উপর রঙ।
মন্দিরেতে কাঁসর ঘণ্টা বাজল ঠঙ্ ঠঙ্।
ও পারেতে বিষ্টি এল ঝাপসা গাছপালা।
এ পারেতে মেঘের মাথায় একশো মানিক জ্বালা।
বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে ছেলেবেলার গান -
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান।"

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের অসংখ্য কবিতা আছে আষাঢ় এবং বর্ষা নিয়ে। বর্ষার মুহূর্তটি কবি বর্ণনা করেছেন এভাবে–

"তখনো অস্ত যায়নি সূর্য, সহসা হইল শুরু
অম্বরে ঘন ডম্বরু-ধ্বনি গুরুগুরু গুরুগুরু!
আকাশে আকাশে বাজিছে এ কোন ইন্দ্রের আগমনী?
শুনি, অম্বুদ-কম্বু-নিনাদে ঘন বৃত্তহিত-ধ্বনি।
বাজে চিক্কুর-হ্রেষা-হর্ষণ মেঘ-মন্দুরা-মাঝে,
সাজিল প্রথম আষাঢ় আজিকে প্রলয়ঙ্কর সাজে।"

ইংরেজ-শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট এই জাতির প্রিয় কবি, বর্ষাকে তার স্বদেশী আন্দোলনের উপমা হিসেবে, জাগরণের উপায় হিসেবে ব্যবহার করেছেন। মেঘের

গর্জনের মতো গর্জে ওঠার তীব্র প্রেরণা জুগিয়েছেন।

"আজি আষাঢ়ের বজ্র-গর্ভ নবীন নীরদ-সম
গরজি উঠুক, হে স্বদেশ, তব মন্ত্র নবীনতম!
আনো খরতর প্রাণদা বন্যা, আনো পশ্চিমি হাওয়া-
টানি লয়ে যাও কঠোর সমুখে, ভোলাও পিছনে চাওয়া।"

জাতীয় কবির এই জাতীয়তাবোধ শোষণের বিরুদ্ধে আজও আমাদের জেগে ওঠার প্রেরণা দেয় বজ্রনিনাদে। সকল অন্যায় জুলুমকে মুখ বুজে সহ্য না করে মেঘের মতো গর্জন করতে বলে।

তাই বর্ষা শুধু প্রাণ ও প্রকৃতির অপরূপ রূপভোগের ঋতুই নয় বরং বর্ষা আমাদের জাতীয় চেতনারও ঋতু।

বর্ষাকাল আমাদের প্রকৃতির জন্য অপরিহার্য এক ঋতু। বর্ষা হলে নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদীগুলো ভরে যায়, ভরে যায় গাঁয়ের পুকুর ডোবা-নালা-খাল-বিল, ঝিলের মতো সকল জলাধার। ভরা নদীতে প্রাণ ফিরে পায় শত প্রকার মাছ ও জলজপ্রাণী। বৃষ্টির পানিতে চাষাবাদ হয়। শস্যশ্যামল হয়ে ওঠে আমাদের ক্ষেতখামার, কৃষিজমি। বৃষ্টি না হলে খরায় বিবর্ণ হয়ে যায় আমাদের ফসলি ক্ষেত। হাজার হাজার হেক্টর কৃষিজমি।

তাই বর্ষা শুধু কবি-সাহিত্যিকদের নয় বরং প্রকৃতির চাষিকবি, জীবিকাসন্ধানী মানুষেরও অন্যতম প্রিয় ঋতু।

বৃষ্টির অপরিহার্যতা অনুধাবন করে বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন দীর্ঘদিন।

বিশ্বের অধিকাংশ অঞ্চলে বৃষ্টি হচ্ছে সুপেয় পানীয়ের বড় উৎস। বিচিত্র জৈবব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখতে, জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি সচল রাখতে ও কৃষি সেচব্যবস্থা সচল রাখতে বৃষ্টির প্রয়োজন হয়। তাই মানুষ কিন্তু এখন কৃত্রিমভাবেও বৃষ্টিপাতের সূচনা করতে চেষ্টারত।

কৃত্রিম বৃষ্টির কথা প্রথম ভেবেছিলেন মার্কিন বিজ্ঞানী ভিনসেন্ট শায়েফার। তিনি বাতাসের জলীয় বাষ্পকে জমাট বাঁধিয়ে মেঘ বানাতে ব্যবহার করেছিলেন জমাটবাঁধা কার্বন-ডাই-অক্সাইডের টুকরা (ড্রাই আইস: Dry Ice)। তিনি বার্কশায়ার পাহাড়ের কাছে ড্রাই আইস ছুড়ে দিয়ে তুলোর মতো মেঘ বানাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই তাকেই কৃত্রিম মেঘের জনক বলা হয়ে থাকে।

কৃত্রিম বৃষ্টি, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আশার বাণী নিয়ে এসেছে। সবচেয়ে বেশি উপকৃত হচ্ছে চীন। চীনের উত্তর অংশে বৃষ্টিপাত সাধারণত খুব কম হয়। পানির অন্যান্য উৎসগুলোর অবস্থাও ভয়াবহ খারাপ। তাই কৃত্রিম বৃষ্টি কাজে লাগিয়ে তারা ইচ্ছামতো বৃষ্টি ঝরিয়ে নদ-নদীর পানি ১৩ শতাংশ পর্যন্ত বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। ২০০৮ বেইজিং অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে বৃষ্টিমুক্ত রাখতেও কাজে লাগানো হয় এই কৃত্রিম বৃষ্টির পদ্ধতি।

কিন্তু কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া আছে কি না, তা এখনও সন্দেহের অতীত নয়। বেইজিংয়ের প্রতিবেশী অঞ্চলগুলো অভিযোগ এনেছে যে, এই প্রক্রিয়ায় তাদের বাতাস থেকে জলীয় বাষ্প টেনে নেওয়া হচ্ছে। যথেচ্ছ কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের এই ব্যবস্থা বৈশ্বিক উষ্ণায়ণও ঘটাতে পারে বলে অনেকে মনে করেন।

তাই অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য এই কৃত্রিম বৃষ্টির চেয়ে প্রাকৃতিক বৃষ্টির ধারা চালু রাখতে প্রকৃতিকে প্রকৃতির মতো করে বাঁচতে দিতে হবে। উষ্ণায়ণ কমিয়ে আনতে হবে।

আর প্রাকৃতিক বৃষ্টির জন্য আমাদেরকে অবশ্যই মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে প্রার্থনা করতে হবে। হাদিসে কুদসিতে আছে আল্লাহ বলেছেন, যদি আল্লাহর বিধিবিধান

সঠিকভাবে মেনে চলা হয় তাহলে মানুষের জন্য উপকারী বৃষ্টি দেবেন তিনি।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেছেন, 'আমার বান্দারা যদি আমার বিধান যথাযথ মেনে চলত, তবে আমি তাদের রাতের বেলায় বৃষ্টি দিতাম আর সকাল বেলায় সূর্য (আলো) দিতাম এবং কখনও তাদের বজ্রপাতের আওয়াজ শুনাতাম না।' (মুসনাদে আহমদ)

আবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই আকাশে মেঘ ও বিদ্যুৎ চমকানো দেখলে এবং গর্জন শুনলে পেরেশান হয়ে যেতেন। মেঘের গর্জনের সময় তিনি কথাবার্তা ছেড়ে দিতেন। মেঘের ভয়াবহতা থেকে নিরাপদ থাকতে তাসবিহ এবং দোয়া পাঠ করতেন।

প্রিয়নবী এ দোয়া পড়তেন-

"আল্লাহুম্মা হাওয়াইলানা ওয়া লা আলাইনা; আল্লাহুম্মা আলাল আকামি ওয়াল ঝিবালি ওয়াল উঝামি ওয়াজ জিরাবি ওয়াল আওদিয়াতি ওয়া মানাবিতিশ শাজারি।"

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমাদের আশপাশে বৃষ্টি বর্ষণ কর। আমাদের ওপরে করিও না। হে আল্লাহ! টিলা, পাহাড়, উচ্চভূমি, মালভূমি, উপত্যকা এবং বনাঞ্চলে বৃষ্টি বর্ষণ কর।' (বুখারি)

কিন্তু এই বৃষ্টির পানি যদি যথাযথভাবে কাজে লাগানো না যায় তাহলে তার ক্ষতিও সইতে হয় আমাদের। যেমন নগরায়ণের ফলে, ডোবা-নালা ভরাটের ফলে, জলাধার দখলের ফলে বৃষ্টির পানি সরার জায়গা না পেলে রাস্তাঘাট ডুবে যায়, নদীখননের অভাবে পলিজমা নদীতে ঠাঁই না পেয়ে বৃষ্টির পানিতে ডুবে যায় কৃষকের ক্ষেত। পয়ঃনিষ্কাশনের অভাবে শহরের রাস্তাগুলো নদীর মতো জলাশয়ে পরিণত হয়। তাই বর্ষার আগেই নদীখনন, পয়ঃনিষ্কাশন করা জরুরি, ডোবা-নালা ভরাট রোধ করা উচিত। তবেই বর্ষার উপকারিতা যথাযথ পেতে পারি আমরা।

অনুশীলন

প্রিয় বন্ধুরা,
আসসালামু আলাইকুম। আশা করি ভালো এবং সুস্থ আছো। এবারও একটি কবিতার প্রথম অংশটি দেওয়া হলো। এর বাকি অংশটুকু লিখে দ্রুত পাঠিয়ে দাও। প্রিয় বন্ধুরা, তোমরা আরও বেশি বেশি করে অনুশীলনে অংশগ্রহণ করবে। আল্লাহ হাফিজ। তোমাদেরই পরিচালক ভাইয়া।

জুলাই ২০২০ মাসের ছড়া

"গরম শেষে আসবে ফের
হিমেল পরশ হাওয়া
আসবে ফিরে নতুন ভোর
সেটাই এখন চাওয়া।"

মে ২০২০ মাসের ছড়া

"গরম গরম বেজায় গরম
এই গরমের ফাঁকে,
আম-কাঁঠালের কাছে যাব
যাব নদীর বাঁকে।"

গরম গরম বেজায় গরম
যাচ্ছি আমি নাইতে,
নদীর তীরে গাছের আম
কী যে মজা খাইতে।

মিরাজ হোসেন
রায়পুর, লক্ষ্মীপুর

শব্দধাঁধা

জুলাই ২০২০ সংখ্যার শব্দধাঁধা

১		২			৩
৪				৫	
	৬				
৭			৮		
৯					

পাশাপাশি : ১. আষাঢ়-শ্রাবণ দু' মাস ৪. নৌকা জাহাজ প্রভৃতির চালক ৫. পরিমাপ করা, জরিপ করা ৭. একটি মুসলিম দেশ ৮. আমাদের প্রতিবেশী দেশ ৯. একটি জেলা।

উপর-নিচ : ১. নিন্দা, অপবাদ ২. কানে কানে বলা কথা ৩. কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা ৬. আকাশে ভাসমান পুঞ্জীভূত জলীয় বাষ্প, জলধর, বারিত ৭. মধুর স্বাদযুক্ত, মিঠাই।

(পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে আমাদের পত্রিকা ছাপা সম্ভব হচ্ছে না। শুধুমাত্র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে আমাদের ইমেইলে স্ক্যান করেও উত্তর পাঠানো যাবে।)

এপ্রিল ২০২০ সংখ্যার সমাধান

ঝ	ড়		ক		পা
ল		আ	ষা	ঢ়	
ক	ল	ম			
	ড়া		গ্রা	না	ডা
ব	ই		ম		মা
ড়		চ			ডো
ই	স	লা	ম		ল

বলতে পারো

এপ্রিল ২০২০ সংখ্যার সমাধান

১. আফ্রিকার জোহানেসবার্গে ২. সূরা নাবা : ৯-১০ ৩. প্রায় ৩০ বছর ৪. নেইত্রন হ্রদে ৫. সিলেট শহরের পাশে তাজপুরে ৬. সিঙ্গাপুর সিটি ও ১৯৬৫ সালে ৭. ৩০৯ বছর ৮. হাজী শরীয়তুল্লাহর ৯. এপিজে আবদুল কালাম ১০. রয়্যাল গার্ডেনের ডিরেক্টর Sir Joshep Banks, ১৭৭৩ সালে।

জুলাই ২০২০ সংখ্যার প্রশ্ন

১. পাখির বাসা কোন কবির রচনা?
২. বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে দেশের মোট ফল উৎপাদনের শতকরা কত ভাগ উৎপাদিত ও বাজারজাত করা হয়?
৩. 'রান আউট না হলে অস্ট্রেলিয়ানরা লারাকে আউট করতে পারত না।' কোন ক্রিকেটার বলেছিলেন?
৪. 'আদম-সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়। সে সময়কে গালি-গালাজ করে। অথচ আমি-ই সময়। রাত ও দিন আমিই পরিবর্তন করি।' কোন গ্রন্থের হাদিস?
৫. 'গোল্ডেন পয়জন ডার্ট ফ্রগ' কোথায় বেশি দেখা যায়?
৬. কাকে 'গণমানুষের কবি' বলা হয়?
৭. জিম্বাবুয়ের রাজধানীর নাম ও সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলার নাম কী?
৮. মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল কিসের জন্য বিখ্যাত?
৯. জুমার দিন প্রথম দিকে মসজিদে গেলে, কিসের সওয়াব পাওয়া যায়?
১০. পৃথিবীর প্রাকৃতিক ফ্রিজার বলা হয় কাকে?

(**সবগুলো প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে কিশোরকণ্ঠ মে ২০২০ সংখ্যায়**। পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে আমাদের পত্রিকা ছাপা সম্ভব হচ্ছে না। শুধুমাত্র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে আমাদের ইমেইলে স্ক্যান করেও উত্তর পাঠানো যাবে।)

একটা কাটলে দুইটা রুই

এ কে আজাদ

ও ভাই শোনো আমজনতা! শোনো সমাজপতি!
গাছ কাটলে হয় দেশের ক্ষতি, হয় যে দশের ক্ষতি।

হাজার রকম পাখ-পাখালি গাছে বাঁধে বাসা,
সকাল সন্ধ্যায় গান শুনিয়ে ছড়ায় ভালোবাসা।
মন খারাপের বিকেল এলে পাখির গানে মাতি,
কিচিরমিচির মধুর সুরে হৃদয় আসন পাতি।
সেই পাখিদের শেষ ঠিকানায় আঘাত করে তাই
কেউ হইও না এমন নিদয় বন্য পশু ভাই!

চোত-বোশেখের ভীষণ রোদে শরীর পোড়ে যখন,
ক্লান্ত পথিক গাছের তলায় ছায়া খোঁজে তখন।
সেই পথিকের সুখের ছায়া দেয় মুছে যে ভাই,
তাহার মতন নিঠুর মানব এই জগতে নাই।

দেখছো কি ভাই- ভীষণ ঝড়ে হানলে আঘাত ঘরে,
দেয়াল হয়ে বুক চেতিয়ে গাছই রক্ষা করে;
যেই গাছেরা বন্ধু হয়ে ঝাপটা এমন রুখে
তার বিনাশে নিজেরই জান তুলছি ভরে দুখে!

স্বার্থ নিয়ে মানুষ খেলে চতুরঙ্গ খেলা,
গাছ কিন্তু বন্ধু হয়ে লাগে কাজের বেলা!
গাছের মতন স্বার্থহীনা মানুষ-বন্ধু নয় গো!
বন্ধুরে যে হত্যা করে সেই কি মানুষ হয় গো!

বিষাক্ত সব অঙ্গার খেয়ে বিলায় অম্লজান,
প্রাণ বাঁচানো ক্রিয়া এমন গাছের অবদান।
গাছে কত আহার জোগায় ফল দিয়ে জল দিয়ে!
কত্তো জীবে শক্তি জোগায় গাছেরা বল দিয়ে!
সবুজ দেখলে চোখের জ্যোতি বাড়ে নাকি শুনি,
গাছের কত গুণ আছে ভাই আমরা কি সব গুনি?

প্রাণের বায়ু সাজিয়ে দিয়ে গাছের সবুজ পাতায়,
মহান প্রভু হিসাব রাখেন জীবন দানের খাতায়।

সেই গাছেদের কেটে আমরা কুড়াল মারি পায়ে,
বুঝি না তো জীবন লুকায় গাছের মিহি বায়ে!
আমাদের প্রাণ-ভোমরা বুঝি গাছের পাতায় থাকে
বুঝি না তো গাছের সাথে আমরাই কাটি তাকে!
গাছ-কাটা আর আত্মহত্যা সমান বলি তাই,
একটা কাটলে বদলায় দুইটা গাছ লাগাবো ভাই!

বাঘ শিকারে একদিন

গল্প

জাফর তালুকদার

বাবার বন্দুক দিয়ে একটা কুঁজো বক গুলি করে মারার পর বুকের ছাতি চওড়া হয়ে গেল। ঘটনার পর থেকে সবাই কেমন যেন একটু সমীহের চোখে তাকায়। ছোট ছেলেরা রাস্তা ছেড়ে দিয়ে ফিসফিস করে। মেয়েদের কথা বলে আর লাভ নেই। চওড়া বুক দেখে তারা ক্ষণে ক্ষণে লাল হয়ে যায়। এখন আর ঘরে বসে থাকার মানে হয় না। যুদ্ধে যাবার মতো ইন্তেজাম শুরু হলো বাঘ শিকারের। বাবা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, 'যাবি যা, সঙ্গে মধুটাকে নিস।' মধু মামা পাকা শিকারি। খুব ভাবসাব বনের লোকজনের সঙ্গে। গেলেই পাস মিলে যায়। নৌকায় চাল-ডাল তুলে রওনা দিলাম। সঙ্গে দুই দুটো বন্দুক। মামারটা দোনলা। আমি নিয়েছি সিঙ্গেল বোর ফ্রান্সের নামকরা সিমপ্লেক্স গান। কার্তুজের অন্ত নেই। এলজি, বুলেট, রেমিংটন সবই আছে। এখন আসল জিনিস সামনে এলেই হলো। একেবারে ফাটিয়ে দেবো। জিতু বলেছিল, যাবার আগে জিম করবেটের 'মানুষখেকো' বইটা একটু পড়ে নিতে। মাস্টারের ছেলে,

কথাবার্তাও মাস্টারি টাইপের। বই পড়ে আবার শিকার শিখতে হবে নাকি! আমি ১০ নম্বর ছররা দিয়ে বক মারা লোক। চিন্তা করে দেখেছি, শিকারটা যদি সত্যি সত্যি হয়েই যায় তাহলে অবস্থা কী দাঁড়াবে! জোহরাকে চিঠির মুসাবিদাটা করে ফেলা দরকার। আমার সামনে দিয়ে ওই পেটপটকা বিল্টুর সঙ্গে হেসে হেসে কথা! দেব নাকি গুলি চালিয়ে। মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তান আমলের বায়ুদোষ। ক্ষেপে গেলে কেবল গালমন্দ আসে মুখে। এখন মাথা ঠাণ্ডা রাখার সময়। শিকারের আগে মনোযোগ নষ্ট হতে দেওয়া যাবে না। মস্তিষ্ক থাকবে ওনাদের নাম মুখে নিতে নেই। সবাই ঠারে ঠারে মামা টামা বলে চালিয়ে দেয়। আমি ঠিক করেছি নানা বলে ডাকবো। কিন্তু ঘুম যে আসে না পোকার কামড়ে! ওদিকে থেমে থেমে নানার ডাক। ডাকতো নয়, প্রলয়নাচন। হুঙ্কারের তোপে নৌকার হাঁড়িকুড়ি ঝনঝনিয়ে উঠছে। এর ভেতর শুরু হল আরেক বিপত্তি। যতবার ডাক আসে ততবার সুড়সুড়িয়ে গিয়ে প্যান্টের বোতাম খুলে বসি নৌকার গলুইয়ের কাছে। বাইরে তাকাতে পারি না। ওনাদের চোখ নাকি টর্চের মতো জ্বলে। মাইল মাইল দূর থেকেও ঠিকঠিক নাতিদের ঘ্রাণ টের পান নাকে। সর্বনাশ!

‘কিরে জ্বর উঠে গেছে দেখছি! আরে পাগল, ওটাতো গুঁইসাপ ছিল। ওই দেখেই তোর...!’

হিমঠাণ্ডা বরফ। পথ বেশি নয়। নদী-খাল বেয়ে বেলাবেলি পৌঁছে গেলাম বনের কাছে। রাতে আমরা থাকবো বনের ভেতর ছোট্ট একটা আঁটোসাঁটো খালে। জোয়ার থাকতে থাকতে যেতে হবে। না হলে ভাটার টানে পানি নেমে যাবে হাঁটুর কাছে। মাঝি ঠিকঠাকমতো নৌকাটা বাঁধাছাঁদা করে মাছের ঝোল দিয়ে খেতে দিল আমাদের। উত্তেজনায় কাঁই হয়ে খেতে পারলাম না তেমন। এই প্রথম বাঘ শিকারে এসেছি। একটু উত্তেজনা তো হবেই। তাছাড়া, চারদিকে ঘন অন্ধকার। নিস্তব্ধ, নিঝুম। ঝিঁঝিঁ আর নানা রকম পশু-পাখির ডাকে কান ঝালাপালা হবার জোগাড়। সব ছাপিয়ে থেমে থেমে ভেসে আসছে নানাজির হুঙ্কার। জঙ্গলে বসে সঙ্গে সঙ্গে সদ্য খাওয়া টেংরা মাছ গুড়গুড়িয়ে উঠলো পেটের মধ্যে। বন্দুকটা ধরে কেবল বুকের কাছে টানছি। ভাগ্নের তাড়না দেখে মামা একচোখ ফাঁকা করে জ্ঞান দিলেন সামান্য, ‘ঘুমো, ঘুমো, ভোররাতে নেমেই গাছে চড়ব। তখন ওনারা বেড়াতে আসবেন খালের কাছে।’ আর বলতে হলো না। টেংরা মাছ এমন জোরে পেটে গাই মারল যে প্যান্ট খোলার সময় পেলাম না। মাঝি গলা খেঁকিয়ে উঠলো সশব্দে, ‘আপনারা যে ক্যান এই পুলাপান লইয়া জঙ্গলে আহেন হেইডা বুঝি না! এহন ঠ্যালা সামলান।’ মামা এবার দুই চোখ ফাঁক করে নাক চেপে বললেন, ‘কিরে, হেগে দিয়েছিস!’ রাত পোহানোর বাকি নেই। মামার কোমর ধরে কোনরকম

পা রাখলাম বনের কিনারে। কেবল অন্ধকার ফিকে হতে শুরু করেছে। মামা সময় নষ্ট না করে ভাগ্নেকে নিয়ে যুতমতো চড়ে বসলেন একটা সুন্দরী গাছের ডালে। আমি ওপরে। মামা নিচে। বসতে না বসতেই ছেঁকে ধরল বাউরা পোকার দল। কামড়ের উৎপাতে প্রাণ যায় অবস্থা। কাঁপাকাঁপির চোটে বন্দুকটা কোনদিকে ধরব বুঝতে পারছি না! এদিকে ওনাদের নাকি এখনি আসার সময় হয়ে গেছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। বুকের ভেতর আওয়াজ দিচ্ছে দ্রিম দ্রিম। হাত-পায়ের নাচনের কথা আর বলে লাভ নেই। কাতর গলায় মামাকে বললাম, 'চল মামা, ফিরে যাই। এখানে কুঁজোবক আছে না, তাই একটা মেরে নেব সকালে।' মুখের কথা মুখেই আটকে থাকে। মামা মুখে আঙুল দিয়ে চুপ করার ইশারা দিলেন। হ্যাঁ, তাইতো, মচমচ শব্দে কী যেন এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। সর্বনাশ, নানা নাকি! বন্দুকটা ঠিকমত ধরে রাখতে পারছি না কেন! নলের মাথাটা দেখি কেঁপে কেঁপে ঠেকে আছে মামার পিঠের ওপর।

এদিকে শব্দটা দ্রুত এগিয়ে আসছে। ছপ, ছপ, ছপ, ছপ। ফিকে অন্ধকারে কালোমতো জন্তুটা মাটিতে বুক ঠেকিয়ে ধীরে ধীরে চলে এসেছে গাছের কাছে। আর দেরি নয়। হাত-পা বিদ্রোহ করে দ্রুত ধপাস করে আছড়ে পড়লাম মাটিতে। কোথায় ছিটকে গেল বন্দুক! কোথায় এলজি, বুলেট! জ্ঞান ফিরতে সময় লেগেছিল অনেক। নৌকার ছইয়ের ভেতর শিকারি ভাগ্নের মাথায় হাত দিয়ে মামা মৃদু হেসে বললেন, 'কিরে জ্বর উঠে গেছে দেখছি! আরে পাগল, ওটাতো গুঁইসাপ ছিল। ওই দেখেই তোর...!' বাকিটুকু শোনার ইচ্ছে হলো না। কান চাপা দিলাম।

সম্পূর্ণ কিশোর উপন্যাস

উরুমকির কান্না

আহমদ মতিউর রহমান

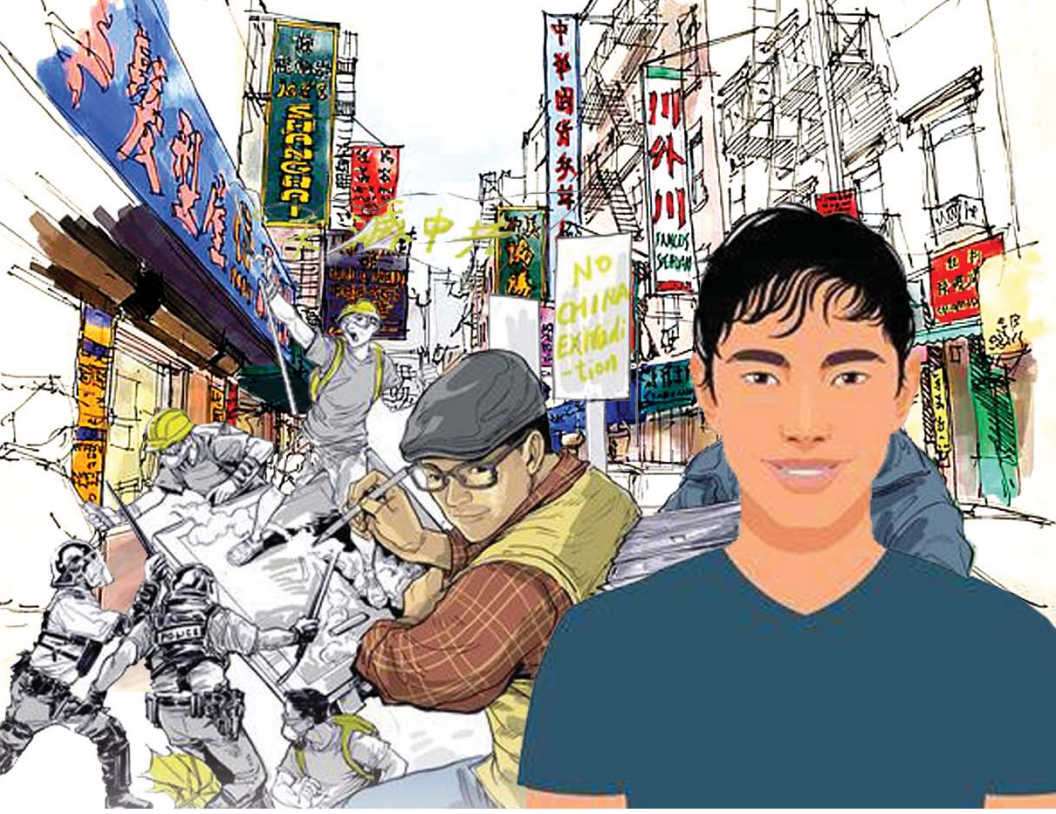

[গত সংখ্যার পর]

আরো সামনে এগুলে আরো বড় বাস্তা, মাও জে দং এভিনিউ। চীনা বিপ্লবের নেতা মাওয়ের নামে নাম।

ফারহাতের তাদের নেত্রী রাবেয়া কাদেরের কথা মনে পড়ে আবার। তিনি এখন সবার দাদীমা। বয়স হয়েছে, জীবনে উইঘুরদের জন্য অনেক লড়াই সংগ্রাম করেছেন। জেলও খেটেছেন। তবে তিনি দমবার পাত্র ছিলেন না। উইঘুরদের রক্ষায় কৌশল হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টির খাতায় নামও লিখিয়ে ছিলেন। আহা বেচারী। কত কষ্টই না করেছেন। সারা বিশ্বকে জানিয়েছেন উইঘুরদের দুঃখের কথা। তার মনটা অনেক বড়। কই তার নামে তো রাস্তার নাম হচ্ছে না। উনি তো এখন দেশেও থাকতে পারেন না। চলে গেছেন আমেরিকায়। সেখানে উইঘুর সংগঠনের সভানেত্রী হয়েছিলেন।

সেখান থেকেও অবসর নিয়েছেন।

প্রথম প্রথম চীনারা তাকে সমীহ করতো। এখন আর করে না। পারলে আটকে রাখে। নানা হুমকি দেয়। তিনিও দমবার পাত্র নন। নেতা নেত্রী তো এমনই হওয়া উচিত। যেমন তিব্বতিদের নেতা দালাই লামা। সংগ্রাম শুরু করে ব্যর্থ হওয়ার পর পাড়ি জমিয়েছেন আরেক দেশে, ভারতে। সেখানে গড়ে তুলেছেন প্রবাসী প্রশাসন। লাসা বা তিব্বত পূর্ণ স্বাধীনতা পায়নি, পায়নি নিজ ধর্ম পালনের পূর্ণ অধিকার। পেয়েছে স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা। আর উইঘুররা তো স্বায়ত্তশাসনও পূর্ণভাবে পায়নি।

সাত.

: কিরে ফারহাত। কী হয়েছে দোস্ত, এই সকালে। তাকে দেখেই ইয়াং লি প্রশ্ন করে।

: না না এমনি। তোর কথা মনে হলো তাই চলে এলাম।

ইয়াং লির ভাবনা তবু যায় না। শুধু শুধু তো সাতসকালে ওর এভাবে আসার কথা নয়। স্কুল বন্ধ। দেখা হয় না কদিন। তবে কি ও যা বলছে তাই ঠিক। ভাবে লি।

: সত্যি করে বল। তোর চোখ মুখ শুকনো লাগছে।

: নারে তেমন কিছু না। সত্যি বলছি। তবে মনটা ভালো নেই। তাই তোর কাছে এলাম।

: মন খারাপের কারণ?

: তুই কয়টা শুনবি? বাদ দে তো। কাজের কথা বল।

ওরা দু'জন একই ক্লাসের ছাত্র। তবে স্কুল আলাদা। একবার এক অনুষ্ঠানে দু'জনের ভাব জমে যায়। সেই থেকে বন্ধুত্ব। একজন আরেক জনের মনের কথা খুলে বলে। আর ইয়াং লি চীনা হান বংশের ছেলে। ওর বাবা পার্টির বড় নেতা। তবে লির মনটা ফারহাতের মতোই। উইঘুর বলে ফারহাতকে আলাদা করে দেখে না। মায়ের সাথে পরিচয় পর্যন্ত করিয়ে দিয়েছে। লি মা বাবার একমাত্র সন্তান। লি কে অত্যাচারী হানদের মতো মনে হয় না।

সামান্য ভাব বিনিময়ের পর একটু খানি নাস্তা মুখে তুলে লির বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়ে ফারহাত। সত্যি কি চলছে তার মনের ভেতর তা সে চেপে যায়। লিকে সব বলা

ঠিক হবে না।

ফেরার পথে আবার সেই মাও জে দং এভিনিউ। এবার সামনে পড়ে গেল আহমেত রাসুলের সামনে। সে তার স্কুলের বন্ধু। ক্লাস মেট। ওকে পেয়ে তো আহমেত বাগবাগ।

: ইয়ার। স্কুলের ছুটি তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করছিস?

: না রে দোস্ত। ব্যাপার মোটেও তা নয়। উইঘুরে কি সব ঘটছে আমার ভালো ঠেকছে না। মনের কথা বলার জন্য লোক খুঁজছি, পাচ্ছি না। লির কাছে গিয়েছিলাম, কিন্তু বলা হলো না।

ফারহাতের সাথে সেই অনুষ্ঠানে আহমেত রাসুলও ছিল। লির কথা তার জানা। তবে আহমেত অনেকটা আমুদে স্বভাবের, সব সময় হাসি আনন্দে থাকতে চায়, হেঁয়ালি করে। কোন কিছুকেই সিরিয়াসভাবে নেওয়ার অভ্যাস তার কম।

: তুই আমাকে খুলে বল। এবার আহমেতের মুখভঙ্গি যথেষ্ট গম্ভীর।

: শুনবি।

: বল না !

: আমার দুই চাচাকে সেনারা তুলে নিয়ে গেছে সাত দিন হলো। কাশগড় তুরপানসহ চার দিক থেকে প্রতিদিনই এরকম নিখোঁজ লোকের খবর আসছে। বিষয়টা আতঙ্কের নয়?

: হ্যাঁ। তাইতো। আমাদের পাশের বাড়ির চারজন পনের দিন ধরে নিখোঁজ। সবাই ভাবছে বেড়াতে বা আত্মীয় বাড়ি গেছে। ব্যাপারটা খোঁজ নিয়ে জানতে হবে। তুই তো তাজ্জব কথা বললি।

: কি বলছি তাহলে! শোন আব্বা কয়েক দিন ঘোরাঘুরি করেও আমার চাচাদের কোন হদিস করতে পারেনি।

: যা যা বাড়ি যা। চাচি ভাববে। আমি একটু পাত্তা লাগিয়ে দেখি মানুষগুলো গেল কোথায়। এক সঙ্গে একগুলো লোক নিখোঁজ। গুম হয়নি তো।

: যাচ্ছি আহমেত। কিছু জানতে পারলে আমাকে জানাস।

ওরা কথা বলার মুহূর্তে একটা সেনা লরি পাশ কাটিয়ে গেল। চালক একা। কোন সৈন্য নেই। যাক বাঁচা গেল।

আহমেত রাসুলের বাবা মেহমেত জাওয়াদাতও একজন ব্যবসায়ী। উরুমকির বড় মসজিদের সামনে তার একটি বই আর কাপড়ের দোকান আছে। দোকানে থরে থরে সাজানো থাকে নানান বই। ফাঁকে ফাঁকে দু' একটি কোরআন শরীফ ও ইসলামী বই। জাওয়াদাত সাহেব ভয় পান না। তার সাফ কথা, আমরা মুসলমান, কোরআন শরীফ আমাদের পবিত্র গ্রন্থ। এছাড়া আমরা বাঁচি কী করে। আর ইসলামী বই কোরআনের পথে চলতে শেখায়। আংকেল বেশ সাহসী। চীনা সেনাদের সাথে এ নিয়ে কতবার তর্ক

ইবনে সিনা আমলা

মেডিকেটেড হারবাল হেয়ার অয়েল

চুল পড়া ও খুশকির হারবাল সমাধান

একটি ইবনে সিনা পণ্য

হারবাল উপাদান সমৃদ্ধ
তাই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মুক্ত

- চুল পড়া বন্ধ করে
- খুশকি দূর করে
- মাথা ঠান্ডা রাখে
- সুনিদ্রা আনয়ন করে
- চুলের অকাল পক্কতা রোধ করে
- নিয়মিত ব্যবহারে নতুন চুল গজায়
- চুলকে করে ঘন কালো, মজবুত ও স্বাস্থোজ্জ্বল

IBN SINA

ন্যাচারাল মেডিসিন ডিভিশন
দি ইবনে সিনা ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি লিঃ
তানিন সেন্টার, ৩ আসাদগেট, মিরপুর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

উরুমকি তো বটেই কাশগড়সহ ঝিনজিয়াং এর সমস্ত স্থানে মুসলমানদের লুকিয়ে চুরিয়ে নামাজ পড়তে হয়, রোজা রাখতে হয়। তা না হলে ধরে নিয়ে সংশোধন কেন্দ্রে রেখে দেবে

বেঁধেছে, কোন কোন বার ধরেও নিয়ে গেছে। কমিউনিস্ট পার্টির এক নেতা তার বন্ধু। তার সুবাদে আর তার নিজের অকাট্য যুক্তির কাছে হার মানতে হয়েছে। তবে সে পরিবেশ দিন দিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এখনকার সেনা সদস্যরা কোন যুক্তি শুনতে রাজি নয়।

আহমেত রসুল তাড়া দেয়-

: আর কি বলবি বল না! ওর মনে কোন দুশ্চিন্তা আছে বলে মনে হচ্ছে না।

: বলছি বলছি। দেখ আমার মনটা খুব খারাপ।

: কেন কী হয়েছে?

: জানিস না! আমার দুই চাচাসহ এ তল্লাটের বহু লোককে ধরে নিয়ে গেছে চীনা সেনারা।

: চিন্তা করিস না। ছেড়ে দেবে। দেখিস না আমার আব্বাকে ধরে নেয়, আর ছেড়ে দেয়।

: না বিষয়টা সে রকম না দোস্ত।

: কী রকম। আহমেত রসুল জানতে চায়।

: তাদের কোন পাত্তাই পাচ্ছি না। কোথায় নিয়ে গেছে কেউ জানে না। বন্দিশিবির, কনসেনট্রেশন ক্যাম্প না সংশোধন কেন্দ্র কিছুই জানতে পারছি না। সেটাই তো ভয়ের কারণ। বিভিন্ন এলাকা থেকে উইঘুর তরুণ যুবা ও উঠতি বয়সের লোকেরা উধাও হয়ে যাচ্ছে। একজন দু' জন নয় শত শত হাজার হাজার।

: তাহলে তো চিন্তার কথা। এবার বললো আহমেত রসুল। তার কপালে চিন্তার ভাঁজ। আবার বললো,

: তুই খাওয়া দাওয়া করে বাসায় চলে যা। আব্বাকে বিষয়টা জানাচ্ছি।

আহমেত রাসুলের মা মারিয়াম জাওয়াদাত ফারহাতকে নিজের ছেলের মতই দেখেন। সব শুনে তিনিও চিন্তায় পড়লেন। তার পরও দু'জনকে যত্ন করে নাস্তা খাওয়ালেন। ওর বাবা মায়ের খোঁজ নিলেন। অবস্থা যে ভালো না বুঝতে পারলেন। আর সব দিক থেকে তার কানে এরকমই খবর আসছে। কত বড় দেশ চীন। আর এত বড় দেশের নেতাদের মন কত ছোট। একটা মানুষের ধর্ম বিশ্বাস- তার ধর্মীয় রীতিনীতি

পালন ওরা সহ্য করতে পারছে না। তার মনটাও খারাপ হয়ে যায়। দ্রুত নাস্তা খাওয়া শেষ করে চলে যায় ফারহাত।

ফারহাতের ইচ্ছে জাওয়াদ চাচার দোকানের সব বই পড়ে ফেলার। চাইলে তিনি দেন। একটা দুটো পড়ে আবার ফেরত দিয়ে দেয়। লুকিয়ে পড়তে হয়, সেনা বা কমিউনিস্ট পার্টির লোকেরা দেখলে পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে কতক্ষণ। মেহমেত জাওয়াদাত অনেক বড় আলেম। ধর্মের প্রতি তার খুব টান। সবাইকে সবক দেন, নামাজের তাগিদ দেন। তার দুরন্ত সাহস। সাহসী বলে সবাই তাকে ভয় পায়। বড় মসজিদের ইমাম সাহেবও তাকে খুব পছন্দ করেন। ইমাম সাহেব আর জাওয়াদ সাহেবের সাফ কথা–

: ওরা আমাদের ধর্ম ভুলিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আমরা তা হতে দিতে পারি না। স্বায়ত্তশাসিত এলাকা হিসেবে নিজ ধর্ম পালনের অধিকার তো আমাদের আছে। একটু সময় করে মহান প্রভুকে ডাকবো তারও উপায় নেই। আল্লাহর নাম ওরা সহ্য করতে পারে না। নামাজ পড়া তো নয়ই দাড়ি রাখতে দেবে না এমনকি রোজা পর্যন্ত রাখতে দিতে চায় না। খোঁড়া যুক্তি, রোজা রাখলে দুর্বল হয়ে যাবে। ফলে কাজ কম করবে, ফাঁকি দেবে। কর্মঘণ্টা নষ্ট হবে। এগুলো আসলে বাজে কথা।

জাওয়াদ চাচার এক কথা : এই বুকে একবার যখন দ্বীন ইসলামের আলো জ্বলেছে তাকে আর কোন দিন কেউ নিভিয়ে ফেলতে পারবে না।

ফারহাত ভাবে এমনই তো হওয়া উচিত। আর এটাই ঈমানের দাবি। এতে যদি জীবন চলে যায় যাক। মৃত্যু তো একদিন আছে। দ্বীনের জন্য শহীদ হওয়া এতো মহৎ কাজ।

সুহানা চাচিও একই কথা বলেন। এটা একটা বাজে অজুহাত। তার কথা: আমি কাজের ফাঁকে অল্প কিছু সময়ের জন্য আল্লাহর ডাকে সাড়া দেবো, নামাজ পড়বো। মন প্রফুল্ল থাকবে। মন থেকে পাপবোধ দূর হবে। যে মহান প্রভু আমাকে সৃষ্টি করেছেন তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবো। মন প্রফুল্ল থাকলে কর্মক্ষেত্রের কাজও ভালো হবে, কাজে বরকত আসবে। এতে তো আর সারা দিন লাগে না। মহান প্রভুই তো বলেছেন, নামাজ শেষে তোমরা রিজিকের সন্ধানে নিজ নিজ কর্মে ফিরে যাও। সুহানা ফারহাতের চাচা রুস্তামের পত্নী। ফারহাতের আব্বার ছোট রুস্তাম। আর সবার ছোট তানজিল। তারা দু'জনই এক সপ্তাহ ধরে নিখোঁজ।

সুহানা চাচি বলেই চলেন, আর মুসলমানরা তো কাজ কম করে না। তাদের উৎপাদনশীলতা তো অন্য চীনাদের চেয়ে কম নয়। তবে কেন এই অপবাদ?

বলতে গেলে উরুমকি তো বটেই কাশগড়সহ ঝিনজিয়াং এর সমস্ত স্থানে মুসলমানদের লুকিয়ে চুরিয়ে নামাজ পড়তে হয়, রোজা রাখতে হয়। তা না হলে ধরে নিয়ে সংশোধন কেন্দ্রে রেখে দেবে।

আট.

চীনের রাজধানী বেইজিং যাওয়ার ফারহাতের খুব শখ। শুনেছে সেটা অনেক বড় শহর। আর দেখতে যেতে ইচ্ছে করে চীনের মহাপ্রাচীর। যার জন্য পৃথিবীব্যাপী চীনের নাম। কত দূর দেশে থেকে এই মহাপ্রাচীর দেখতে লোকজন আসে। চীনের মহাপ্রাচীর 'দি গ্রেট ওয়াল অব চায়না' নামে খ্যাত। চীনা ভাষায় নাম ছাং ছং। অর্থ দীর্ঘ প্রাচীর। পাথর মাটি দিয়ে তৈরি দীর্ঘ প্রাচীর সারি এই গ্রেট ওয়াল। এই প্রাচীর খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকে ১৬ শতক পর্যন্ত চীনের উত্তর সীমান্ত রক্ষা করার জন্য তৈরি। এ রকম অনেক প্রাচীর তৈরি করা হয়েছিল তবে ২২০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ থেকে ২০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ মধ্যবর্তী সময়ে চীনে প্রথম সম্রাট কিন শি হুয়াওয়ের অধীনে নির্মিত প্রাচীরই সবচেয়ে বিখ্যাত। এটি বর্তমান প্রাচীরের অনেক উত্তরে অবস্থিত এবং খুব সামান্যই অবশিষ্ট আছে। বর্তমান প্রাচীরটি মিং রাজবংশের আমলে নির্মিত।

চীনের মহাপ্রাচীর মানুষের হাতে তৈরি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় স্থাপত্য। এটা ভাবলে ফারহাতের বুকটা গর্বে ফুলে ওঠে। তেমনটা হয় আহমেত রসুল বা তার অন্য বন্ধুদেরও। কিন্তু তা আবার সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে যায়। উইঘুর মুসলমানরা পদে পদে লাঞ্ছিত। এই গৌরব কি তাদের প্রাপ্য? যদিও ঝিনজিয়াং চীনের অংশ কিন্তু তবু কিসের যেন একটা বাধা। বাধার কারণ উইঘুররা নয়, চীনা আর হানরা। এর পরও বুকের মধ্যে ভিন্ন একটা অনভূতি এনে দেয় চীনের মহাপ্রাচীর। হোক না তারা স্বাধীনতা বঞ্চিত, তারা তো চীনেরই, আর এই মহাপ্রাচীর তাদের ঐতিহ্য। বইয়ে পড়েছে ফারহাত এই প্রাচীর প্রায় পাঁচ থেকে আট মিটার উঁচু এবং ৬৫৩২ কিলোমিটার লম্বা। এটি শুরু হয়েছে সাংহাই পাস এ এবং শেষ হয়েছে লোপনুর নামক এলাকায়। এর মূল অংশের নির্মাণকাজ হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ২০২ সালে। নির্মাণ শুরু হয় কিং সাম্রাজ্যের সময়। চীনের প্রথম সম্রাট কিন সি হুয়াং এটি প্রথম ব্যবহার করেন। শত্রুর হাত থেকে দেশ রক্ষায় সাম্রাজ্য রক্ষায় তিনি এই প্রাচীর দীর্ঘ করে নির্মাণ করেন। বিভিন্ন অঞ্চল পাহারায় ও উত্তর চীনের উপজাতি সুইং নু বা হান জাতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এটি প্রথম স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল। হান সুই, নবদান ও জিন সাম্রাজ্যের সময় ইতিহাসেও যে কারণে তারা এটি তৈরি করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে ঠিক একই কারণে চীনের প্রাচীরের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সম্প্রসারণ ও পুনর্নির্মাণের উল্লেখ আছে। দেয়ালটিতে নিয়মিত

আগস্ট মাস ব্যাপি

৫০% কমিশনে

আপনি কি?
আপনার সন্তানকে সৎ, চরিত্র ও আদর্শবান হিসেবে গড়তে চান?
তা হলে, গল্প আকারে রচিত বইগুলো সংগ্রহ করুন।

নিম্নে উল্লেখিত ২৬টি বই দাম ৩৬৬৫/- এখন ১৮০০ টাকা

১. আল কুরআনের গল্প, ২. ছোটদের প্রিয় নবী (স.), ৩. হাদীসের গল্প, ৪. ছোটদের মূসা নবী (আ:), ৫. হযরত ওমর (রা.) গল্প কথা, ৬. ছোটদের হযরত আলী, ৭. আবাক সেনাপতি, ৮. ছোটদের শেখ সাদী, ৯. খলিফা ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ, ১০. এখনি ফিরে এসো, ১১. ছাত্রদের বলছি, ১২. বিশ্বনবীর উপদেশ, ১৩. ছোটদের আদর্শ মহানবী মুহাম্মদ (সা.), ১৪. হে বোন তোমাকে বলছি, ১৫. চরিত্র গঠনের নামাযের ভূমিকা, ১৬. রহস্যের চাদর, ১৭. পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০টিপস, ১৮. খালিদ বীন ওয়ালীদ, ১৯. স্পেন বিজয়ী মূসা, ২০. গ্রানাডার শেষ বীরের গল্প, ২১. হযরত আয়েশা ও উম্মে আয়মান (রা.), ২২. গল্পে গল্পে ছোটদের ৩৬৫ দিন, ২৩. শিকলপড়া হাতের পরশ, ২৪. মাকে খুশি করার ১৫০টি উপায়, ২৫. দৈন্দিন জীবনের পর্দা, ২৬. ছোটদের ইউনুস নবী (আ.)। **প্যকেজ ১**

৬৭৯০ টাকায় নিম্নোক্ত ৩১টি বই এখন ৩৩০০ টাকা

১. রিয়াদুস সালেহীন-১-৪, ২. এন্তেখাবে হাদীস (১-২ একত্রে), ৩. রাহে আমল ১-২, ৪. আসান ফেকহ ১–২, ৫. ফিকাহ্ মোহাম্মদী, ৬. পয়গামে মোহাম্মদী আটটি ভাষণ, ৭. কবিরা গুনাহ্, ৮. মাতাপিতা সন্তানের অধিকার, ৯. রাসূলুল্লাহর বিপল্লবী জীবন, ১০. বিশ্বশান্তি ও ইসলাম, ১১. মহিলা সাহাবি , ১২. ইসলামের সৌন্দর্য, ১৩. কুরআন হাদিসের আলোকে জ্যোতির ভাষ্য, ১৪. জান্নাত লাভের উপায়, ১৫. ইসলামের সামাজিক বিধান, ১৬. দারসূল কোরআন (শেষ ১৪ সূরা), ১৭. ইসলামী আন্দোলন ভবিষ্যৎ কর্মকৌশল, ১৮ দৈনন্দিন জীবনে পর্দা, ১৯. আদর্শ পরিবার ও পারিবারিক জীবন, ২০. ৩৬৫ দিনের ডায়েরি (কোরআন,হাদিস ও দোয়া), ২১. হাসীদের পরিচয় ও ইতিবৃত্ত, ২২. বিশ্ব নবী (সা.)-এর অমিয় বানী ১, ২, ২৩. আদাবে জিন্দেগী, ২৪. আল্লাহর ভয়ে কাদা, ২৫. রাসূলুল্লাহর (স) নামায। **প্যকেজ ২**

বিশেষ সেট

১৩টি বই মূল্য ৭১২ টাকা এখন ৩৫০ টাকা মাত্র।

১. মজবুত ঈমান। ২. চক্ষু শিতরকারী পরিবার গঠন। ৩. জান্নাত লাভের উপায়। ৪. নির্বাচিত আয়াত হাদীস সংকলন। ৫. কবরের ৩টি প্রশ্ন জীবনের মূল মন্ত্র। ৬. নামায কেন কবুল হয় না। ৭. ইহকাল থেকে পড়কালে। ৮. জবানের গুনাহ। ৯. আদর্শ সমাজ গঠনে মহিলাদের দায়িত্ব। ১০. দৈনন্দিন জীবনে পর্দা। ১১। চরিত্র গঠনে নামাজের ভূমিকা। ১২. মানুষের কাজেই আসে গজব? বাচার উপায় কি। ১৩. আখেরাতের প্রস্তুতি। **প্যকেজ ৩**

নতুন সিলেবাসের আলোকে ৩টি প্যাকেজ

১. কর্মী, তাফহীম ২টি, হাদিস ১টি, সাহিত্য ১৬টি ৮০০ টাকা।
২. সাথী, তাফহীম ১১টি, হাদিস ৪টি, সাহিত্য ৩০টি ৩২০০ টাকা।
সাথী সাহিত্য (পাঠ্য ৩০টি বই) ১৬৫০ টাকা।
৩. সদস্য, কুরআন হাদীসসহ ১২৫০০ টাকা, সাহিত্য (৮০টি বই) ৭৭০০ টাকা।

রুকন (সদস্য) শিক্ষিত বই ৬৭টি, হাদীস ৪টি ৪২০০ টাকা মাত্র।
সল্প শিক্ষিত বই ৩৪টি, তাফহিম ১টি, হাদীস ২টি ১৭০০ টাকা মাত্র।
কর্মী বই ৩০টি, তাফহিম ১টি হাদীস ২টি ১২০০ টাকা মাত্র।

আজই আপনার চাহিদা জানিয়ে অর্ডার দিন আমরা আছি আপনার পাশ্বে

এছাড়াও পাবেন :

১. তাফসীরে ফী জিলালিল কুরআন ১-২২ খণ্ড ৩২০০, তাফসীরে ইবনে কাসির ১-৮ খণ্ড ৩০০০ টাকা।
২. তাফহীমূল কুরআন ১–১০ খণ্ড, ১-১৯ খণ্ড।
৩. কুরআনের পয়গাম ১-৩ খণ্ড,
৪. শব্দার্থে কুরআন- ১–১০।
৫. শব্দে শব্দে কুরআন ১-১৪ খণ্ড।
৬. সহীহ বুখারি ১–৬ খণ্ড।

ডাক ও কুরিয়ার সার্ভিসে বই পাঠানো হয়

ফাহিম বুক ডিপো

ফাহিম বুক ডিপো

৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা। মোবাইল ঃ ০১৯৮১-১৪৩১১১, ০১৭১২-২৮৭৬৯৫ (বিকাশ) ০১৯৮১-১৪৩১১১৪ (রকেট)
E-mail: fahimbookdepo11@gmail.com,
FB: Facebook.com/Fahimbookdepo.official

বিরতিতে পর্যবেক্ষণ চৌকি আছে। যা অস্ত্র সংরক্ষণ সেনা অবস্থান যে কোন সংকেত প্রদানে কাজে লাগতো। সেনা ঘাঁটি ও প্রশাসনিক কেন্দ্র আছে দূরে দূরে। এ ছাড়া দেখার সুবিধার জন্য আছে সংকেত টাওয়ার।

নয়.

চীনা ভাষা বড় বিচিত্র। কোন অক্ষর নেই। বর্ণচিত্র বা পিকটোগ্রাফই হচ্ছে এই ভাষার অক্ষর। এ রকম ১৫০০ বর্ণচিত্র আছে যা একেকটি ভাব প্রকাশ করে। চীনাদের এগুলো মুখস্থ করতে হয়। চীনা তিব্বতীয় ভাষা পরিবারের চীনা শাখার ভাষা। চীনা শাখার ভাষারসমূহ অনেক সময় চীনা নামে পরিচিত। যদিও ম্যান্ডারিন বা চীনা ভাষা গণচীন ও চীনা প্রজাতন্ত্রের (তাইওয়ান) একমাত্র সরকারি ভাষা। কথ্য চীনা ভাষার বিভিন্ন রূপ আছে। ভাষা বিজ্ঞানীদের মতে চীনা ভাষা গোষ্ঠীতে সাত থেকে পনেরোটি ভাষা বা উপভাষা আছে। অনেক উপভাষা এখনো সঠিকভাবে শ্রেণীকরণ হয়নি। উইঘুর ভাষাকে চীনারা তেমন মর্যাদা দেয় না। আরবি শিখতে চাইলে তো ভয়ানক বিপদ। উইঘুর ভাষার পাশাপাশি ঝিনজিয়াংবাসীকে ম্যান্ডারিন ভাষাও শিখতে হয়।

দশ.

সব শুনে ফারহাতের আরেক বন্ধু উলহানের কপালেও ভাঁজ পড়ে।

: চিন্তারই কথা। কোথায় যেতে পারে তারা।

: খোঁজ করে দেখেছি কোথাও যায়নি।

: তবে তো বাড়ি ফিরে আসবে।

: কই আসছে না তো।

: তুই কি করবি ঠিক করেছিস। থানায় যাবি। বাবাকে বলবো?

: না না। থানায় গিয়ে হুজ্জত বাড়িয়ে কাজ নেই বন্ধু। আরো কিছুদিন দেখি।

: তোর যা ইচ্ছে। তুই চাস তো বাবাকে বলে পার্টি লেভেলে পাত্তা লাগাতে পারি। অসহায়ের মতো বলে থামে ছেলেটি। শিন উলহান হান জাতিভুক্ত। কিন্তু ফারহাতের খুব ভালো বন্ধু। উইঘুর বলে ফারহাতকে আলাদা করে দেখে না। ওর একটাই চিন্তা ফারহাতের দুই কাকা বহুদিন নিখোঁজ। এটা তো ভাববারই কথা। বন্ধুকে কিভাবে সান্ত্বনা দেবে ভাষা খুঁজে পায় না শিন।

: কে কে? ভেতর থেকে শিনের মায়ের গলা। ওকে খেয়ে যেতে বলিস। আদেশের সুরে বললেন শিনের মা। পৃথিবীর সব মা-ই মনে হয় একই রকম। ফারহাতের মনে পড়ে যায় মায়ের সোহাগ মাখা মুখখানি। তার আদরের দুই দেবর নিখোঁজ। তাই তারও দুঃখের সীমা নেই।

এতক্ষণ কথা হচ্ছিল বাড়ির আঙ্গিনায়। শিনের মা বোধ হয় আড়াল থেকে সব কথা শুনেছেন। শিনের মা একটা স্কুলের ম্যাডাম। বাচ্চাদের পড়ান। বাচ্চাদের নিয়েই তো তার কারবার। বাচ্চাদের মন তিনি ভালো বোঝেন। ফারহাতকে তিনি ছেলের মতো দেখেন। ভালোবাসেন। ফারহাতের মা তার সাথে স্কুলে পড়েছে। ফারহাতের মাও শিক্ষক, আরবি শিক্ষক। শিক্ষক আর ক্লাসমেট বলে কথা। সম্পর্কের সূত্র সে থেকেই। তার স্বামী শিন কিম ইয়াং ছোটখাটো ব্যবসা করেন। পার্টিতেও সময় দিতে হয়। তিনি অন্য প্রদেশের মতো ফুলটাইমার নন। কমিউনিস্ট পার্টির ফুলটাইমারেদের কোন চাকরি করতে হয় না। পার্টির কাজে পুরো সময় দিতে হয়। এটা অটোনোমাস এলাকা তাই এখানে ফুলটাইমার ছাড়াও পার্টি কর্মী আছে। ব্যবসাতেও নানান ঝক্কি। পার্টির লোকদের সামাল দিতে হয়, পুলিশ আর্মিকে টাকা পয়সা থেকে শুরু করে নানা তথ্য দিতে হয়। স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই।

এখানেও কাজ হলো না। চাচাদের ভাগ্য সম্পর্কে কিছুই জানা যাচ্ছে না। অল্প কিছু মুখে তোলে। বেশি খেতে পারে না। শিনের মা পাশে দাঁড়িয়ে দু' বন্ধুর খাওয়া দেখেন। হানদের খাবার স্টাইলও অন্য চীনাদের মতো। তবে ভিন্নতাও আছে। অনেকে চপস্টিকে খায়। আবার কেউ কেউ হাতেও খায়। হাতে খাওয়া ওরা শিখেছে উইঘুরদের কাছ থেকে। দু' বন্ধু খেতে বসে চুক চুক করে খাচ্ছে। দেখতে ভালো লাগে শিনের মা মিসেস শিন ইয়াং এর। তিনি লক্ষ করেন ছেলেটা তেমন খেতে পারেছে না। আহা বেচারা।

: কি অতো ভাবনা। দেখো তোমার দুই চাচা ঠিক বাড়ি ফিরে আসবেন। তোমার মা কেমন আছেন?

ফারহাত ভাবে যাক ভালোই হলো। তাকে অতো বুঝাতে হচ্ছে না। আড়াল থেকে সব শুনেছেন তিনি।

: আম্মা ভালো আছেন আন্টি। আর আপনি ঠিকই বলেছেন। আল্লাহ চাহে তো তারা যেন ঠিক ঠিক ফিরে আসেন।

: যাও বাড়ি যাও। আমি শিনের বাবাকে বলে একটা খবর বের করার চেষ্টা করবো।

: তাই করুন আন্টি। আর আপনার কথা যেন সত্য হয়।

এক সময় শিনদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে ফারহাত। এবার বাড়ি ফিরতে হয়। আম্মা ভাববেন। ছেলেটা কোথায় গেল।

এগারো.

পথে দেখা হয়ে গেল আরেক চীনা বন্ধুর সাথে।

: নি হা অ। শুরু করে চীনা ভাষায়। যাকে বলে ম্যান্ডারিন। মানে ভালো আছ? চীনা বংশোদ্ভূতদের সাথে ম্যান্ডারিন বা স্থানীয় চীনা ভাষায় কথা বলে উইঘুর মুসলমানরা। এই ভাষা ওদের রপ্ত করতে হয়। ফারহাতেরও তা জানা। অবশ্য নিজেদের মধ্যে ওরা উইঘুর ভাষাই ব্যবহার করে।

ওর নাম ইয়ে লিং। ছেলে হিসেবে ভালো। মানুষের প্রতি ওর মমত্ববোধ ভালো লাগে ফারহাতের। উইঘুর বলে কাউকে আলাদা করে দেখতে সে রাজি নয়। বয়সে ফারহাতের চেয়ে কিছু ছোট হবে। এক সাথে খেলতে খেলতে পরিচয়। ওরা মুসলিম বলে দূরে ঠেলে দেয় না।

: নি হা অ। অর্থাৎ তুমিও ভালো আছ? ইয়ে লিং এর সাথে চীনা ভাষায় জবাব দেয় ফারহাত।

: হাও মিঅ বুজিয়ান। মানে অনেক দিন দেখা হয়নি। এটা বলে চঞ্চল হয়ে পড়ে ইয়ে লিং।

: জিয়ে জিয়ে জিয়ে নি। ধন্যবাদ, তোমাকে ধন্যবাদ। ফারহাতের খোঁজ খবর করায় সে ধন্যবাদ জানায় ইয়ে লিংকে।

: বু ইয়ং জিয়ে। ধন্যবাদের প্রয়োজন নেই। ডুইবুকি। মানে দুঃখিত তোমার সাথে বহু দিন দেখা হয়নি। বলে আফসোস করে লিং।

: মেই গুয়াংজি। মেই গুয়াংজি। শিঅ। অসুবিধা নেই, অসুবিধা নেই বন্ধু। জবাবে বলে ফারহাত। আবার বলে-

: যহুদি শেং বি কুযাইলে। শুভ জন্মদিন। তোমাকে জন্ম দিনের শুভেচ্ছা। হ্যাপি বার্থ ডে। চীনারা আজকাল কিছু কিছু ইংরেজি শিখছে। গ্রিটিংস আর হ্যাপি বার্থ ডে ইত্যাদি তাদের জানা। তবু চীনা ভাষায় গ্রিটিংস জানালো ফারহাত।

আজ লিং এর জন্মদিন। ফারহাত এটা মনে রেখেছে। জেনে ভালো লাগলো ইয়ে

লিং এর। সে খুব খুশি হয়। তার চোখ আনন্দে চিক চিক করে ওঠে। জন্মদিনে অভিনন্দন পেতে কার না ভালো লাগে।

: তুমি মনে রাখলে কী করে। জানতে চায় লিং।

: আমার সব কিছু মনে থাকে বন্ধু। অবাক হচ্ছো? বললো ফারহাত।

: যাই জিয়াং। আবার দেখা হবে। ডুঅ বাওঝং। ভালো থেকো। যেম্নে লে। মানে কী হয়েছে? তোমার মুখটা শুকনো লাগছে।

: না না কিছু না। কথা কাটায় ফারহাত। ছোট মানুষ লিং। তাকে তার দুঃখের কথা শুনিয়ে কী লাভ।

তারা দু'জন পাশের একটা আইসক্রিম পার্লারে ঢোকে। আইসক্রিম দু'জনেরই পছন্দ। উইঘুর মুসলিম আর চীনা হান হলে কী হবে এ জায়গায় তাদের মিল আছে। এই সময়টা ঠাণ্ডা একটু কম। আইসক্রিম নিশ্চিন্তে খাওয়া যায়।

জন্মদিন উপলক্ষে লিংকে কী গিফট দেওয়া যায় ভাবছে ফারহাত। শেষ পর্যন্ত একটা কলম কিনলো। জন্মদিন উপলক্ষে সেটা পেয়ে খুব খুশি ইয়ে লিং। হোক না একটা কলম। গিফট তো গিফটই। এ যে অমূল্য।

ফারহাতেরও ভালো লাগছে ছোট্ট হলেও একটা উপহার দিতে পেরে। লিং কি বুঝে গেছে তার মনের অবস্থা। তাকে সব কিছু বলে দেওয়া ঠিক হবে? ওর বাবা পার্টি ক্যাডার, মানে ফুলটাইমার। পার্টির স্থানীয় নেতা। ভালো না খারাপ হবে সাত পাঁচ ভাবতে আর বলা হয় না।

আইসক্রিম পার্লারের বিল মিটিয়ে দিল ইয়ে লিং। ফারহাতই দিতে চেয়েছিল। কোন মতেই তাকে দিতে দিল না।

: আমার জন্মদিনে গিফট দিলে, ধরো এটা আমার পক্ষ থেকে উপহার। চাইলে আরো কিছু খেতে পার। বললো লিং।

: না না আমি দেব বিল। আমি তোমাকে খাওয়াব। জোরাজুরিতে কাজ হলো না। বিল মিটিয়ে রাস্তায় নেমে আসে দু'জন।

বাতাসের ঝাপ্টায় দোকানের সামনে টবে রাখা গাছের পাতা দুলছে। ছোট্ট বাঁশজাতীয় গাছ। চিরল চিরল পাতা। খুব সুন্দর দেখায়। চীনে বাঁশ গাছ আর চেরি ফল গাছের খুব সমাদর। আর টবে টবে আছে চায়না বট গাছ। সবখানে দেখা যায়।

ওরা রাস্তায় নামতেই একটা মিলিটারি ভ্যান শাঁ করে বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল। ভেতরে কয়েকজন বন্দী। কে জানে আবার কাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। অজানা আশঙ্কায় আবার আবার মনটা ভারি হয়ে আসে ফারহাতের। তবে লিংকে বুঝতে দেয় না। এখানে আবেগ প্রকাশের জায়গা নয়।

বিদায় বলে দু'জনে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আলাদা গন্তব্যে হাঁটা দেয়।

বারো.

আরো কিছু নিখোঁজ লোকের বিষয় জানা গেছে। নাজমিদিন রেমান নেদারল্যান্ডস প্রবাসী উইঘুর মুসলিম। বাড়ি কাশগড়ে। তার পরিবারের ৪ জন সদস্য ৪ বছর ধরে নিখোঁজ। ফেসবুকে সে তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। তার আকুল আবেদন 'আমার পরিবারের লোকদের খুঁজে দিন'। কে দেবে? কে করবে এ কাজ। তার মায়ের নাম ফেরকাত জাওয়াদাত। বোন সিনাওয়ার তুরসুম।

তুরস্কে থাকে মেমেত তোহতি আতাউল্লাহ। তার ভাই রুজি মেহমেত আতাউল্লাহ দু'বছর ধরে নিখোঁজ। নেদারল্যান্ডসে আছে আরো এক উইঘুর ছেলে শেফকাত হেকিম। তার পরিবারের চার সদস্যেরও কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। কাশগড় শহর থেকে মা এ বছর আগে শেষ বারের মতো কথা বলেছেন। মা জানিয়েছেন, আর কল করো না। হানরা বোধ হয় জেনে গিয়েছিল তার ফোন কলের কথা। কত হারামি হলে মাকে বলতে পারে ছেলে যেন আর কল না দেয়। শুধু বাঁচার তাগিদে এই কথা শত ব্যথা বুকে চেপে ছেলেকে বলতে হয়েছে। তার পর শুধু কান্না। তিন বছর পর শেফকাত খবর পায় তার দাদা আর বেঁচে নেই। ২০১৬ সালে তাকে কাশগড় বন্দিশিবিরে নেওয়া হয়। তিনি সেখানে অসুস্থ হয়ে এক মাসের মধ্যে বলতে গেলে বিনা চিকিৎসায় মারা যান। শেফকাতের দুঃখের এখানেই শেষ নয়। ২০১৯ সালের মার্চে তার বাবা মারা যায় ক্যাম্পে। তার মা, ছোট ভাই, আরো দুই বোনসহ অনেক আত্মীয় বন্দিশিবিরে আছে। হাজার হাজার বন্দী সেখানে। বন্দিশিবিরের পোশাকি নাম সংশোধন কেন্দ্র। আসলে মগজ ধোলাই কেন্দ্র, আর তা পারা না গেলে মানুষ মারা কেন্দ্র। শেফকাত কাশগড় শহরের এক থানায় ফোন করে কিছু জানতে পারেনি। পরে সে নেদারল্যান্ডসে চীনা দূতাবাসে যোগাযোগ করে এবং তার পরিবারের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ চায়। কিন্তু চীনাদের কাছ থেকে কোন সাড়া পায়নি। এখন কান্নাই তার সম্বল। মা বাবা দাদা ও ভাই বোনের জন্য কান্না।

আবদুর রাহিম গনি একজন সয়েল অ্যানালিস্ট। কাশগড় থেকে বেরিয়ে সেও গেছে নেদারল্যান্ডস। তার পরিবারের সদস্যদেরও একই অবস্থা। তার পরিবারের সাকুল্যে ১৫ জন নিখোঁজ। তারা এখন কোথায় সে জানতে পারেনি। এখন কেঁদে কেঁদে জীবন পার করছে।

নরওয়েবাসী বাহদিয়ার ওমর উইঘুর মুসলিম। প্রবাসজীবনে তারও সঙ্গী কান্না। তুরপান শহরে সে বাবা মাসহ সবাইকে রেখে এসেছিল। তার পরিবারের সদস্যদের এখন কোন খবর নেই। উইঘুর টাইমস অনলাইন থেকে এসব খবর জানা যায়। এগুলো শুধু জানতে পারে প্রবাসীরা।

ভাগ্য ভালো থাকলে কেউ কেউ ফোন কলে আত্মীয়দের জানাতে পারে। উইঘুরে সে সুযোগ নেই, কেননা সেখানে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ। ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগের সব মাধ্যমই এখন বন্ধ। বাইরের মিডিয়ার সাথে সব যোগাযোগ বন্ধ। গোপনে গোপনে এসব খবর পেয়ে যায় উইঘুর পরিবারগুলো।

তেরো.

দশ দিন হয়ে গেল। তার পর পনেরো দিন। না, ফারহাতের কোন চেষ্টাই সফল হলো না। কী করা যায়। আর কোথায় যাবে সে। থানায় অভিযোগ দিলে কোন লাভ হবে না। এটা ঠিক। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না।

ড্রইংরুমে একাকী বসে ফারহাত।

: ভাইয়া, তোর কি হয়েছে বল তো! ছোট বোন রিহানা এসে পাশে দাঁড়ায়। আরো বলে-

: আয়নায় দেখ তোর চেহারাটা।

: রাখ তো তোর আয়না। কাকারা ভোজবাজির মতো উধাও। ১৫ দিন। আর তুই বলছিস আমার কী হয়েছে?

: তুই একা কী করবি ভাইয়া। আমরা কি কম চিন্তা করছি। দাদী আর চাচিরা তো নাওয়া খাওয়াই ছেড়ে দিয়েছে। তুই, আব্বা, বড় ভাইয়া তোরা সবাই উদভ্রান্তের মতো ছুটে চলেছিস। এটা ঝিনজিয়াং। আমরা কমিউনিস্টদের হাতের পুতুল। আর এটাই আমাদের ভাগ্য। ভাগ্যকে মেনে নিতেই হবে রে ভাই।

: তুই এসব কথা কবে শিখলি? বোনের কথায় অবাক না হয়ে পারে না ফারহাত।

: কিছু মুখে দিয়ে কোথায় যাবি যা। বলে থামে রিহানা। তার চোখের কোণেও চিক চিক করে পানি। বোঝা যাচ্ছে সে কম দুঃখে কথাগুলো বলেনি।

কোন রকমে সামান্য পরিমাণ খাবার খেয়ে আবার বেরিয়ে পড়ে ফারহাত। কোথায় যাবে জানে না।

চৌদ্দ.

অনেকক্ষণ পার্কে বসে থাকলো ফারহাত। বাড়ি ফিরে যাবে না। কতক্ষণ টেনে টেনে গাছের পাতা ছিঁড়লো। কে একজন এসে খবর দিল–

: তুই এখানে বসে আছিস আর তোদের বাড়িতে কেয়ামত চলছে।

: কী বলছিস। আমি এই ঘণ্টাখানেক আগে বাসা থেকে এসেছি।

দ্রুত বাড়ি ফিরলো ফারহাত। এসে দেখে রক্তারক্তি কারবার। আম্মা আর রিহনার লাশ রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে সোফায়। দাদী নিজের ঘরে হাউ মাউ করে কাঁদছে। সারা বাড়ি তছনছ। আব্বা আর বড় ভাইয়াসহ দুই চাচিকে ধরে নিয়ে গেছে চীনা সেনারা। সাথে পার্টির লোকরাও ছিল। ছিল ইয়াং লির বাবা। সে-ই সব দেখিয়ে দিয়েছে। পার্টির বড় নেতা বলে কথা। ছিঃ ছিঃ ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে।

এটা নাকি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ঘাঁটি। তাই এই অভিযান। ওদের সবাইকে ধরে নিয়ে গেছে থানায়। সেখান থেকে নেওয়া হবে বন্দিশিবিরে। যেখানে আটক রয়েছে লাখ লাখ উইঘুর মুসলমান। তারা কবে ফিরবে, আদৌ ফিরবে কি না কেউ জানে না। ফারহাত লুটিয়ে পড়লো রক্তাক্ত নিথর মায়ের কোলে।

: আম্মা কথা বলো, কী করে হলো এসব? ওরা এত নিষ্ঠুর কেন? আমাকে মেরে ফেললো না কেন। রক্তে ভিজে যাচ্ছে ফারহাতের শার্ট প্যান্ট। সে দিকে তার ভ্রুক্ষেপ নেই। রিহানার লাশ সোফার ওপর আলতো করে পড়ে আছে। জামা কাপড় রক্তে মাখা। তার চোখ দুটি খোলা। যেন ভাইকে প্রশ্ন করছে, ভাইয়া চাচাদের কোন খবর পেলি? বোনের লাশের দিকে চেয়ে আর্তনাদ করে উঠলো ফারহাত। মনে হলো সমগ্র উরুমকি কাঁদছে। কখন এই কান্না থামবে কেউ বলতে পারে না। একটু পর বড় মসজিদের ইমাম সাহেব ঘরে ঢুকলেন। তিনি রিহানার চোখ দুটোর পাতা বুজিয়ে দিলেন পরম যত্নে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। লাশ দুটোর দাফনের ব্যবস্থা করতে হবে। **[সমাপ্ত]**

বৃষ্টি পড়ে

হাসান রুহুল

ঝম ঝমা ঝম বৃষ্টি পড়ে
আষাঢ় শ্রাবণ মাসে
খাল বিল সব ভরে ওঠে
বন্যা নেমে আসে।

কদম ফুলের সুবাস ছড়ায়
বৃষ্টি ভেজা বাতাসে
মেঘ গুড় গুড় মেঘ গুড় গুড়
নাচে ওঠে আকাশে।

বিজলি উঠে ঝিলিক দিয়ে
আকাশের কোন বাঁকে
বজ্রপাতের ভয়ে খোকা
মায়ের আঁচলে মুখ ঢাকে।

বৃষ্টি ভেজা পাখিরা সব
ভাঙা বাসায় নেয় ঠাঁই
অনাহারে থাকে তারা
কষ্টের কোন শেষ নাই।

বিশেষ রচনা

কুয়ালালামপুর থেকে পচেফস্ট্রুম

আহমেদ বায়েজীদ

মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরের কিলাত ক্লাব মাঠ আর দক্ষিণ আফ্রিকার পচেফস্ট্রুমের সেনওয়েজ পার্ক। বাংলাদেশের ক্রিকেটের দুই সোনালি অধ্যায়ের মঞ্চ। প্রায় ২৩ বছরের ব্যবধানের দুটি ঘটনা লাল-সবুজ জার্সিধারীদের দুটি বড় অর্জন। এই ২৩ বছরে এদেশের ক্রিকেটে আরো অর্জন এসেছে। বাংলাদেশ বিশ্বকাপ খেলেছে, টেস্ট পরিবারে নাম লিখিয়েছে, বড় কিছু জয় পেয়েছে; কিন্তু সব কিছুর পরেও ওই দুটি দিন এদেশের ক্রিকেটে সোনালি অধ্যায় হয়ে থাকবে।

যথার্থ কারণও রয়েছে। প্রথম ঘটনাটি এদেশের ক্রিকেটের ভিত্তি গড়ে দিয়েছিল। ১৯৯৭ সালের

আইসিসি ট্রফি জয়ের পরই মূলত শুরু হয়েছে এদেশে ক্রিকেটের বিস্তার। আকরাম-বুলবুলদের হাত ধরেই বিশ্ব ক্রিকেটের মূল ধারায় জায়গা করে নিতে পেয়েছে বাংলাদেশ। তোমরা যারা কিশোর, তাদের সেই দিনের স্মৃতি মনে থাকার কথা নয়, কারণ তোমাদের জন্মই তো হয়েছে সেই ঘটনার পরে। আমাদের দেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে যাদের বয়স ত্রিশের বেশি, তারাই কেবল সেই ঘটনার সাক্ষী ছিলেন। রেডিওতে চৌধুরী জাফরউল্লাহ শরাফতের কণ্ঠে জয়ের সেই মুহূর্তের ধারাভাষ্য শোনার সাথে সাথেই শুরু হয়ে গিয়েছিল বিজয় মিছিল।

সেবার আইসিসি ট্রফির ফাইনালে যাওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ ১৯৯৯ সালে ইংল্যান্ড বিশ্বকাপে জায়গা করে নেয়। ফাইনালে কেনিয়ার বিপক্ষে টানটান উত্তেজনার লড়াইয়ে শিরোপা জিতে আনন্দে ভাসায় দেশকে। দেশের ক্রিকেটের প্রথম অর্জন হিসেবে তাই চির অমলিন আইসিসি ট্রফির শিরোপা। আর বিশ্বকাপে গিয়ে পাকিস্তান ও স্কটল্যান্ডকে হারানোর পরই বাংলাদেশ টেস্ট স্ট্যাটাস পাওয়ার দাবি জোরালো করতে পেরেছিল। বিশ্বকাপের ওই দুই সাফল্যের কারণে দ্রুত ধরা দেয় টেস্ট খেলার সৌভাগ্য। তাই বিশ্ব ক্রিকেটে আজ টাইগারদের যে পথচলা, তার শুরুটা হয়েছিল আইসিসি ট্রফি জেতার মাধ্যমেই।

আর এর ঠিক ২২ বছর ৯ মাস ২৬ দিন পর দক্ষিণ আফ্রিকার পচেফস্ট্রুমে আকবর আলীর দল জিতেছে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ শিরোপা। বয়সভিত্তিক পর্যায়ে হলেও এটি বিশ্ব সেরার মর্যাদা। অর্থাৎ

দক্ষিণ আফ্রিকার পচেফস্ট্রুমে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ শিরোপা হাতে আকবর আলীর দল

যুব ক্রিকেটে বাংলাদেশ বিশ্বের সেরা দল। তাই এই অর্জনও বাংলাদেশের ক্রিকেটের সেরা অর্জনগুলোর একটি। ২৩ বছরের ব্যবধানের এই দুই অর্জনের কোনটি বড় সেই প্রশ্ন অমূলক। কারণ সময়ের ব্যবধান, দুই সময়ে এদেশের ক্রিকেটের অবস্থান- কোন কিছু বিবেচনায়ই একটির সাথে অন্যটির তুলনা হয় না।

আইসিসি ট্রফি আইসিসির টুর্নামেন্ট হলেও সেখানে অংশ নেয় সহযোগী সদস্য দেশগুলো। যাদের কোনটিই ক্রিকেট কাঠামো শক্তিশালী নয়। অর্থাৎ সেরা ক্রিকেট খেলুড়ে দেশগুলো এই প্রতিযোগিতার বাইরে থাকে। আর বাংলাদেশও তখন ক্রিকেট বিশ্বে হাঁটিহাঁটি পা করে চলতে শুরু করেছে। তেমন একটি সময়ে ওই আন্তর্জাতিক শিরোপা এদেশের ক্রিকেটের গতিপথই পাল্টে দিয়েছে। আকবর আলীর দল যে উন্নত প্রশিক্ষণ, বিদেশী কোচিং স্টাফ, অনেক ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছে- মোট কথা তারা যে ক্রিকেট কাঠামোর মধ্যে বেড়ে উঠেছে সেটির সূচনা হয়েছিল আকরাম খানের দলের সেই অর্জনের পর। হাসিবুল হোসেন শান্তর ব্যাটে '১ বলে ১ রানের' সেই স্নায়ুক্ষয়ী জয়ের পর যে পথ রচনা হয়েছিল সেই পথে চলেই ভারতকে ফাইনালে হারিয়ে আকবর আলীদের এই অর্জন। আইসিসি ট্রফি না জিতলে এদেশে এত দ্রুত ক্রিকেটের বিস্তার হয়তো হতো না।

তুলনা না করে দুটো ম্যাচের মধ্যে চাইলে অনেকগুলো মিল খুঁজে পাওয়া

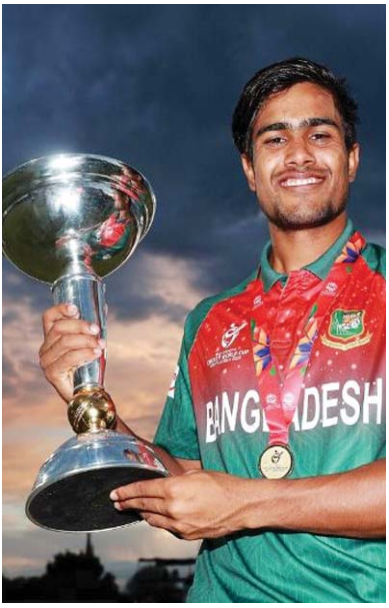

যাবে। দুই ম্যাচই ছিল বৃষ্টিবিঘ্নিত। দুই জায়গাই আশা-নিরাশার দোলাচলে ছিলো বাংলাদেশের ইনিংস। কখনো হারের শঙ্কা, কখনো আশার আলো আর ব্যাটসম্যানদের দাঁতে দাঁত চেপে লড়ে যাওয়া। দুটো দলই অপেশাদার ক্রিকেটারদের এবং উভয় দলই নিজ নিজ সার্কিটের সেরার খেতাব অর্জন করেছে। আর তার চেয়েও বড় মিল দুটো দলই দেশকে এনে দিয়েছে গৌরব। যে গৌরব চির অমলিন। দিন মাস বছর কেটে যাবে, আমাদের ক্রিকেটে আরো বড় বড় অর্জন আসবে; কিন্তু শত বছর পরেও এদেশের ক্রিকেটের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে গেলে ফিরে আসবে কুয়ালালামপুর, পচেফস্ট্রুমের বিজয় গাথা।

বৃষ্টি পড়ে

আজাদ শেখ

বৃষ্টি পড়ে পুকুর খালে
ঝুমঝুমিয়ে গাছের ডালে।
ব্যাঙের ছাতায়
গাছের পাতায়
বৃষ্টি থেকে বাঁচতে গিয়ে
গাঁয়ের বধূ ঘোমটা মাথায়।

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ে
টুনটুনিদের বুনো ঘরে
ফিঙে মাচায়
ছোট্ট বাসায়
মা পাখিটা বসে থাকে
প্রাণটা নিয়ে বাঁচার আশায়।

বর্ষা আসে খুকুর পাঠে
দূর্বা ঘাসের সবুজ মাঠে
নদীর বাঁকে
পাতার ফাঁকে
বৃষ্টি এলে ভয়ে খোকা
জড়িয়ে ধরে মাকে।

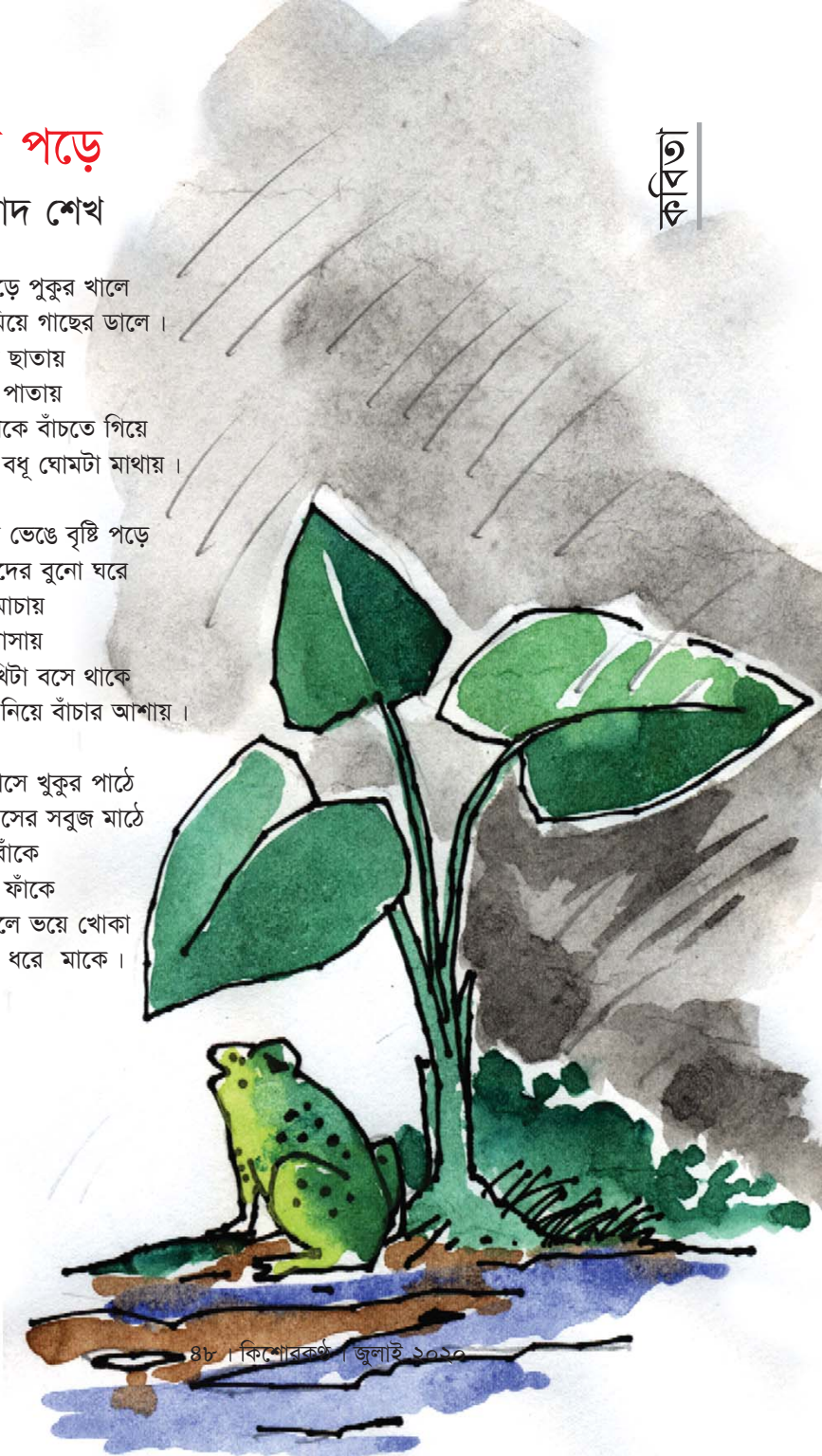

অন্য গ্রহের মানুষ

দেলোয়ার হোসেন

গোলাম আলি মন্ডল, মুখ বাঁকা, মাথা গোল; ছেলেদের এসব কথা শুনে গোলাম আলি মাস্টার কোনো দিকে না তাকিয়ে দ্রুত হেঁটে চলে যান স্কুলে। প্রথমদিকে তিনি বাজারের রাস্তা দিয়েই যেতেন। তাঁর মাথার ওপর কাল রঙের একটি ছাতা। তিনি অযথা কারো সাথে কথা বলতে যান না। কিন্তু তাকে দেখলেই উঠতি বয়সের ছেলেরা সমস্বরে বলতে থাকে "গোলাম আলি মন্ডল, মুখ বাঁকা মাথা গোল।" ছেলেদের কথায় তিনি রাগ করেন না। কিন্তু মনে-মনে কষ্ট পান। ছেলেরা অনেক সময় তার দিকে ঢিলও ছোড়ে। কখনো তিনি অতিষ্ঠ হয়ে বলেন, মুরব্বিদের প্রতি এ তোমাদের কেমন ব্যবহার? এতটুকুই। তবে, রাগলে তিনি কী করবেন আর কী করতে পারেন এ ধারণা অনেকেরই নেই।

এখন তিনি রেললাইন ধরে হাঁটেন। কিন্তু ছেলেদের চোখ এড়াতে পারেন না। ঐ এক বুলি তাকে শুনতেই হয়।

স্কুলের ছেলেরা ব্ল্যাকবোর্ডে ছাতা

মাথায় একটি লোক এঁকে নিচে লিখে রাখে– "গোলাম আলি মন্ডল, মুখ বাঁকা মাথা গোল।" মাস্টারের মনটা খারাপ হয়ে যায়। তিনি ছাত্রদের বলেন, তোমরা বিদ্যা অর্জনের জন্য স্কুলে এসেছো। দুষ্টুমি চিন্তা যদি মনের মধ্যে বাসা বাঁধে তা'হলে বিদ্যা অর্জন করা সম্ভব হবে না। তা ছাড়া গুরুজনদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকা অবশ্যই কর্তব্য। আমার মুখটা একটু বাঁকা দেখালেও আমি তো তোমাদের ভুল শিক্ষা দেই না।

কিছু ছেলে আছে তারা সত্যি ভালো। মাস্টার দেশ-বিদেশের অনেক গল্প শোনায় ছেলেদের। আকাশে নক্ষত্রমণ্ডলী কে-কোথায় অবস্থান করছে, কার কী কাজ এবং গভীর সমুদ্রের তলদেশে কত রকম খনিজপদার্থ আছে সে সব কথাও তিনি বলেন। তিনি বাড়িতে প্রচুর বই-পত্র পড়েন। অনেক কঠিন-কঠিন বিষয় নিয়ে ভাবেন। যে কারণে তুচ্ছ বিষয়গুলো তিনি মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দেন।

শুক্র ও শনিবার তিনি মোস্তাজ চেয়ারম্যানের বৈঠকখানায় যান। বলতে গেলে এটা তাঁর অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। সেখানে গ্রামের আরও পাঁচ-সাতজন ব্যক্তি উপস্থিত হয়। তারাও মন্ডলকে নিয়ে নানান রকম রসিকতা করে। কখনও তাঁর ছাতাটা লুকিয়ে রাখে, আবার কখনও তাঁর জুতার হদিস পাওয়া যায় না। এসব নিয়ে হর-হামেশাই হাসা-হাসি করে সবাই। মন্ডলের খুব রাগ হয় ঠিকই কিন্তু কাউকে কিছু না বলে রাতের বেলা অন্ধকার পথে একা-একা বাড়ি ফিরে আসেন।

রাতে জঙ্গলের পথ ধরে মাস্টার বাড়িতে ফিরে যান; এ নিয়েও তাকে কথা শুনতে হয়। কেউ বলে, মন্ডলের কি ভূতের ভয় নেই? মন্ডল উত্তরে বলেন, ভূত থাক্ আর নাইবা থাক্ তাকে নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। মাস্টারকে ভূতের ভয় দেখাতে কেউ ভূতের মত সেজে ডোবার ধারে হিজল গাছের ডাল থেকে লাফিয়ে পড়েছে তার সামনে। মাস্টার সাহেব চমকে উঠেছেন ঠিকই; কিন্তু ভয় পাননি। এই ছমির তুই কি ভূত? এ কথা বলতেই ছমির ভূত দৌড়ে পালিয়েছে।

আজ আড্ডায় স্যাটেলাইট নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলছিলো। সবুজ মাতবর বলছিলো, আজ সন্ধ্যার পর আকাশটা কেমন আগুনের মত হয়ে উঠলো। উত্তর দিকে কুড়ুদের বিশাল বাঁশ-বাগানের ওপর দিকে একটা আলো দেখা গেলো। চোখের পল্‌কেই আবার হারিয়ে গেলো। বছরখানেক আগেও দেখা গিয়েছিলো অন্ধকার আকাশ আলোকিত করে একটা চক্র যেনো ঘুরছে। পরে জানা গেলো ওটা ছিলো রাশিয়ান স্যাটেলাইট। আরেকজন বললো, পৃথিবী থেকে প্রায় চারশত মাইল ওপর দিয়ে ঘুরছিলো সেটা। এখন কত দেশ রকেট ছাড়ছে, বিজ্ঞানের খেলা চলছে পৃথিবী জুড়ে। উকিল সাহেব বললেন, এখন তো অন্য গ্রহ থেকেও মানুষ আসছে আমাদের পৃথিবীতে। আমরা দেখতে পাই না; কিন্তু তারা সব দেখতে পায়।

সোনামিয়া চুপ করেই ছিলো, সে হঠাৎ বললো, অন্য গ্রহের মানুষেরা আমাদের চেয়ে অনেক উন্নত। হাওয়ার গাড়িতে আসে আবার হাওয়ার গাড়িতে ভেসে চলে যায়।

গোলাম আলি মাস্টার আলোটা দেখেছে কুড়ুদের বিশাল বাঁশ-বাগানের মধ্যে। বাগানের ওপর দিকে একটা নীল

আলোর আভা ছড়িয়ে আছে। উকিল সাহেব বললেন, স্যাটেলাইট-ফাইট নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার কী। বিজ্ঞানের যুগ, কালে-কালে কত কিছু দেখা যাবে। আকাশে কি আলোর অভাব আছে? একটা কিছু দেখলেই পরদিন কাগজে তা নিয়ে ফলাও করে লেখা হচ্ছে।

বাবুল বয়সে অন্যদের চেয়ে ছোট– সে বললো, সবই তো মানুষেরই তৈরি তবে, সে মানুষ যে গ্রহেরই হোক; মহান সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি নিয়ে ভাবতে গেলে মাথার মধ্যে গোলমাল শুরু হয়ে যায়। উকিল সাহেব বললেন, লোক নেই, জন নেই যন্ত্র চলচ্ছে। আর রকেট তো অজানা কত খবর পাঠাচ্ছে তা পাঠাক না। যদি আমাদের দেশে একটা কিছু তৈরি হতো, তা'হলে গর্ব করার বিষয় হতো। অন্য একজন বললো, অন্য গ্রহ থেকে সাপ, ব্যাঙ যাই আসুক সেটা আমাদের এই জঙ্গলা দেশে কেন আসবে? আমেরিকা, জাপান, ইংল্যান্ড আরও কত দেশ আছে গেলে তারা সেখানে যাবে। শত-বছরের পচা ডোবা থেকে আগুনের আভা উঠতেই পারে তা নিয়ে ভাবনার কী আছে। ভূতও তো আলোর পিণ্ড হয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ছুটে বেড়ায়। এসব কথা বলে সবাই যে যার চায়ের কাপে ঠোঁট ছুঁয়ালো। মাস্টার সাহেব চুপ করে ভাবতে লাগলেন, বাইরের গ্রহ থেকে যারা আসবে তারা বড় শহরে কেন; বন-জঙ্গলেও আসতে পারে। নির্জন জায়গা তাদের জন্য বেশ নিরাপদ। তবে তারা ভূত নয়; আবার বাঘ, ভাল্লুকও নয়। এদেশের ভাষা না বুঝলেও তারা যথেষ্ট বুদ্ধিমান। কিন্তু তারা দেখতে যে কেমন, এটাই হলো বড় কথা। তবে মনে হয়, পৃথিবীর মানুষের মত পালোয়ান নয়। এ কথা তো সত্য যে যারা বেশি খায়, তাদের বুদ্ধি কম। বাঙালিরা খেয়ে আর রসিকতা করেই দিন কাটায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠিকই বলেছেন, পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর ঢেউ যখন আমাদের দেশে এসে লাগে তখনও আমরা লাউয়ের জাঙ্গলা নিয়ে ক্যাইজা আর মারামারি করি।

তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ভাবলেন, এসব কথা এদের কাছে বলে নিজেকে আর অপমানিত করতে চাই না। এবার উঠি বেশ রাতও হয়েছে আজ। সবাইকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন, আজ বেশ রাত হয়ে গেলো এবার আমি চলি। সোনামিয়া বললো, বাঁকা যেতে চাচ্ছে যাক; তবে ভূতে ধরলে চিৎকার দিও।

আসলে মাস্টারের মুখটা একটু বাঁকা আর রাগের মাথায় বেশি কথা বলতে গেলে সব তালগোল পাকিয়ে যায়। সবার এলোমেলো কথায় মনটা তার বিশ্রি রকম খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। মাস্টার সাহেব জঙ্গলা পথে এগিয়ে বাঁশ-বাগানের কাছাকাছি গিয়ে সত্যি একটা সবুজ আলো দেখতে পেলেন। যেন কোন হিরা থেকে একটা আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি প্রথম ভাবলেন, শুকনো লতা-পাতায় বুঝি আগুন লেগেছে। বনের মধ্যে খানিকটা জায়গা ফাঁকা এবং নিচু। হঠাৎ তার মনে হলো; ঝিঁঝি পোকারা ডাকছে না, অন্য কোন সাড়া-শব্দও নেই জঙ্গলে। এমন নীরব অবস্থা তো আগে কখনও দেখিনি। কেমন যেন থম্‌থমে ভাব।

মাস্টার সাহেব কৌতূহল বশে বাঁশ-বাগানের সেই আলোটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। ছড়ানো উজ্জ্বল আলোটা

স্থির। তখনই চিঁচি একটা একটানা শব্দ তার কানে এলো। মাস্টার সাহেবের গাটা একটু ছম্‌ছম করে উঠলো। তবুও এগিয়ে চললেন তিনি। ডোবার থেকে বিশ-পঁচিশ হাত দূরে ঘন বাঁশঝাড়টা পেরোতেই তিনি দেখতে পেলেন বেশ বড় একটা কাচের বাটির মত জিনিস ডোবাটা জুড়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। আর তার স্বচ্ছ ঢাকনার ভেতর থেকে মোহময় এক তীব্র কিন্তু স্নিগ্ধ নীলচে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

এমন অদ্ভুত দৃশ্য মাস্টার সাহেব স্বপ্নেও কখনও দেখেন নাই। অবাক হয়ে চেয়ে থাকলেন তিনি। জিনিসটা স্থির হলেও নির্জীব নয়। বুকের শ্বাস-প্রশ্বাসের মতই একটু একটু ওঠা-নামা করছে। আর একটু ভালো করে দেখার জন্যই তিনি একেবারে কাছেই চলে গেলেন। হঠাৎ তাঁর শরীরে বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে গেলো। তিনি অনুভব করলেন; অদৃশ্য কিছু দিয়ে তাঁর হাত এবং পা বেঁধে ফেলা হয়েছে। তাঁর আর নড়বার শক্তি নেই। তিনি না পারছেন এগোতে, না পারছেন পেছাতে।

কিছুক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর জিনিসটার স্পন্দন থেমে গেলো। হালকা সেই শব্দটাও আর শোনা গেলো না। কাচের ঢাকনার একটা কপাট যেনো সরে গেলো আর মানুষের মত অত্যন্ত মিহি স্বরে চিৎকার এলো "ডং চিং ডাং মিলি পিলিং"।

মাস্টার সাহেব চম্‌কে উঠে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকলেন। ভাবলেন, এ আবার কী রকম ভাষা? শব্দটা আবার হতেই মাস্টার সাহেবের বুকটা ধড়াস করে উঠলো। হু আর ইউ? হু আর ইউ?

মাস্টার বুঝলেন, তাকেই প্রশ্নটা করা হচ্ছে– তাই তিনি বললেন, আই অ্যাম গোলাম আলি মন্ডল স্যার।

প্রশ্ন এলো আর ইউ ইংলিশ?

গোলাপ আলি মাস্টার চেঁচিয়ে বললেন, নো স্যার– বাঙালি। এদেশের নাম বাংলাদেশ। পরাধীন ছিলাম, প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর হলো; স্বাধীনতা লাভ করেছি।

আর ইউ মুসলিম?

ইয়েস স্যার।

আস্‌সালামু আলাইকুম।

মাস্টার উত্তরে বললেন, ওয়ালাইকুম আস্‌সালাম।

অদ্ভুত এক প্রাণী। মাথাটা বেশ বড়। শরীরে তেমন মাংস নেই বললেই চলে। মাথা বাদ দিয়ে হালকা-পাতলা একটা গোলাপি কাপড়ে তার দেহটা ঢাকা। লোকটা এক'পা-দু'পা করে এগিয়ে এলো। সে এক দৃষ্টিতে মাস্টারকে দেখতে লাগলো। তারপর মিহি স্বরে বললো, তুমি মানুষ? ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

মাস্টার বললেন, জি।

লোকটা বললো এটা তো পৃথিবী, তোমাদের দেশ বাংলাদেশ?

জি।

সে বললো, যাবার কথা ছিলো মঙ্গলে, অসাবধানে যন্ত্রপাতি গোলযোগের কারণে এসে পড়েছি বাংলাদেশে। এই বলে সে একটু মৃদু হাসলো। মাস্টার কী বলবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলো না। লোকটা একেবারে মাস্টারের কাছে তার লম্বা-লম্বা আঙুল ছোঁয়ালো মাস্টারের মুখে। তারপর তার গা, হাত, পাও টিপে-টিপে দেখতে আরম্ভ করলো লোকটা। শেষে বললো, আমি ক্রোসিয়ান গ্রহের অ্যাং। আমি মানুষের চেয়ে অনেক উচ্চ স্তরের প্রাণী।

মাস্টার মনে মনে হাসলেন। চার ফুট প্রাণী সে আবার মানুষের চেয়ে অনেক বুদ্ধিমান? কথাটা বুঝে ফেললো অ্যাং। সে বললো, তুমি কয়টি ভাষা জানো?

মাস্টার বললেন, বাংলা, ইংরেজি আর কিছুটা উর্দু।

অ্যাং বললো, তার মানে আড়াইটা, আর আমি জানি পনেরো হাজার ভাষা। তা ছাড়া ত্রিশটি গ্রহের ভাষা আমার জানা আছে। তোমার বয়স কত?

এবার পঞ্চান্নতে পড়েছে।

আমার বয়স সাতশত বিয়াল্লিশ। তোমরা মাংস খাও?

হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল মহিষ সবই খাই।

আমরা মাংস খাই না– সবজি খাই। তবে অনেক আগে মাংস খেতাম।

অ্যাং গোলাকার একটা ছোট পাথর দিলো মাস্টারের হাতে। সেটা হাতে ধরতেই মাস্টারের শরীরটার মধ্যে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেলো। সে তখনই সেটা ফেরত দিলো অ্যাংকে। অ্যাং বললো, এটার এমন শক্তি যে কোন শত্রু মরবে না তবে সে অথর্ব হয়ে পড়বে। মাস্টার নির্বাক। অ্যাং বললো, তুমি কি কিছু দেখতে চাও? যা জীবনে দেখোনি? মাস্টার মনে মনে ভাবলো বাংলাদেশের কত জায়গাই তো এখনও দেখা হয়নি। তবে টেলিভিশনের মাধ্যমে অনেক জায়গা দেখেছি। শুনেছি সমুদ্রের তলদেশে কত কিছু আছে, তা- একবার নিজের চোখে দেখার বড় ইচ্ছা। অ্যাং ছোট একটি কাচের নল মাস্টারের হাতে দিয়ে বললো, এখানে চোখ রাখো দেখতে পাবে।

মাস্টার নলের মুখে চোখ লাগাতেই দেখলেন, গভীর সমুদ্রতলায় ছোট-বড় অনেক পাহাড়। সেগুলো সোনার মত ঝক্‌মক করছে। তিনি বললেন, ঐ পাহাড়গুলি কি স্বর্ণের?

হ্যাঁ, সব স্বর্ণের পাহাড়।

হাদিস শরীফে এরকম সব কথা আছে। শুনেছি একদিন সমুদ্র সব শুকিয়ে যাবে আর ঐ স্বর্ণ নিয়ে পৃথিবীতে যুদ্ধ লেগে যাবে। লোভে পড়ে মানুষ শুধু একে অন্যের হাতে মরতেই থাকবে; তবু কেউ থেমে থাকবে না। মাস্টার আর চোখ রাখতে পারলেন না। মাথাটা বোঁ-বোঁ করছে। তিনি যন্ত্রটা ফেরত দিলেন।

অ্যাং বললো, এবার বুঝলে তো আমরা মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

মাস্টার বললেন, একশত ভাগ সত্য।

অ্যাং বললো, তোমায় দেখে, তোমার হাত, পা টিপে মনে হলো যে তুমি নিকৃষ্ট প্রাণী হলেও মানুষটা ভালো। তবে তোমার দোষ হচ্ছে যে, তুমি নিরীহ, তাই তুমি জীবনে উন্নতি করতে পারনি। অন্যায়ের প্রতিবাদ না করা তোমার দোষ। তুমি অপমান সহ্য করো– এটা কোন প্রাণীই করে না। তোমার সাথে কথা বলে বেশ ভালো লাগলো। আর সময় নষ্ট করা যাবে না– এবার আমাকে যেতে হবে।

মাস্টার কিছু বলার আগেই অ্যাং সেই গ্লোবের মত যন্ত্রটার ভেতরে ঢুকলো আর ঘূর্ণি বাতাস ছড়িয়ে চোখের পল্‌কে উধাও হয়ে গেলো। তারপরই বন জুড়ে ঝিঁঝি পোকারা ডাকাডাকি শুরু করলো, দূরে কোথাও হুতুম পেঁচাও ডেকে উঠলো। জোনাকিরাও আলো জ্বেলে ওড়াউড়ি শুরু করলো।

তারপর; মাস্টার বাড়ির পথে পা রাখতেই তার মনের মধ্যে একটা জোসের

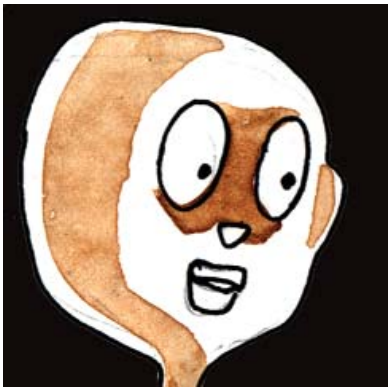

ঢেউ গড়ালো। তিনি মনে-মনে ভাবলেন, কী আশ্চর্য! কী অদ্ভুত! সারা পৃথিবীর কারোর সঙ্গে নয়; শুধু তার সঙ্গে দেখা দিলো, কথা বললো, সৌরজগতের এক অজানা গ্রহের একজন লোক– লোক মানে অ্যাং। নিজেকে অন্য এক মানুষ ভাবতে শুরু করলেন মাস্টার।

পরদিন ছিলো শনিবার। চেয়ারম্যানের বাড়িতে চলছিলো জমাট আড্ডা। গতকালের আলোর খবর কাগজে বেরিয়েছে। নেহাতই নগণ্য দু'চার কথা। সেটাকে ফ্যালিং সসার বা উড়ন্ত পিরিচের মত গুজবের মধ্যে টেনে আনা হয়েছে।

আজ কুন্ডু বাড়ির রবিও এসেছে। তার পঁচিশ বিঘা বাঁশবনের মধ্যে যে ডোবাটা আছে, তার চারপাশের বাঁশঝাড় নাকি রাতারাতি একেবারে ন্যাড়া হয়ে গেছে। এই বিষয়েই কথা হচ্ছিল, এমন সময় উকিল সাহেব হঠাৎ বলে উঠলেন, আজ গোলাম আলি মাস্টারের আসতে দেরি হচ্ছে কেন? ব্যাকা না থাকলে আড্ডাটা পুরোপুরি জমে না।

চেয়ারম্যান বললেন, তা বললে তো চলবে না– মাস্টারকে তো আসতেই হবে। বাবুল দরজা পর্যন্ত এগিয়ে যেতেই মাস্টার এসে হাজির। তিনি যেন ছোট-খাটো একটা দম্‌কা হাওয়া কাঁধে করে নিয়ে এসেছেন। উপস্থিত সবাই কেমন থম্‌কে গেলো।

তারপর; সত্যি যেন ঝড় উঠলো। মাস্টার পুরা এক মিনিট ধরে হো-হো করে অট্টহাসি হাসলেন। এমন হাসি এর আগে কেউ কখনও শোনেনি এমনকি মাস্টার নিজেও না।

হাসি শেষে মাস্টার একটা প্রচণ্ড গলা খাঁকরানি দিয়ে গভীর গলায় বলতে শুরু করলেন, উপস্থিত বন্ধুগণ, আমি খুবই আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এই সন্ধ্যাকালীন আড্ডায় আজই আমার শেষ দিন। কেননা আপনারা সবাই অযথা বক্‌বক করেন। আপনাদের অন্যায় ছেলেমানুষি আমার মনটাকে তিক্ত করে দিয়েছে। প্রয়োজন হলে এই আসরে আমার মিনি বিড়ালটাকে পাঠিয়ে দিব।

ও-হ আজ দেখি রবি কুন্ডুও এসেছে। খবরটা সবাই শুনে রাখুন– গতকাল রাতে ক্রেসিয়ান গ্রহ থেকে একটা অ্যাং এসে ঐ বাঁশ-বাগানের নিচু জায়গাটির মধ্যে নেমেছিলো। আমার সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে, সে সত্যি ভালো।

এইটুকু বলেই মাস্টার উকিলের পিঠে একটা তব্‌লার চাটি মেড়ে সদর্পে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সবাই হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকলেন তার গমন পথের দিকে। আজ কেউ তার মুখটা বাঁকা দেখলেন না; বা এত কথা বলার পরও কোথাও তার কথা আটকালো না। ঠিক তখনই চেয়ারম্যান সাহেবের হাতটা কাঁপতে-কাঁপতে গরম চা ঢেলে পড়লো তার সাদা ধপ্‌ধপে পাঞ্জাবির ওপর।

শুকরিয়া

তোফায়েল প্রধান

শিশু যেমন মায়ের কোলে
নিরাপদে থাকে,
আল্লাহ তা'লা রহমত দিয়ে
তেমনি করে রাখে ।

তবু কেন সেই সে প্রভুর
করো না কেন কাজ,
এতো নেয়ামত করছো ভোগ
পাও না তো তবু লাজ ।

এতো কিছু দুনিয়াতে
দিছেন প্রভু ঢেলে,
কত রহম করেন তিনি
দেখো না চোখ মেলে?

বুঝো না তো মগজ দিয়ে
পাচ্ছো কোথায় হাওয়া,
কার হুকুমে প্রতিদিনই
হচ্ছে আসা যাওয়া ।

রোগে শোকে কত মানুষ
আছে হাসপাতালে,
শুকরিয়া কি করছো আদায়
কবে কোন কালে?

পাচ্ছো কোথায় কথা বলার
সাহস তুমি বুকে,
বোবার দিকে তাকাও তুমি
কাঁদছে ধুঁকে ধুঁকে ।

কথার জবাব কথা দিয়ে
দিচ্ছো তুমি রুখে,
কে দিয়েছে এমন শক্তি
স্বীকার করো মুখে?

কত মানুষ কষ্টে আছে
রাখছো কি তার খবর,
মাথার মধ্যে মগজ আছে
নাকি আছে গোবর?

শুকরিয়া যে সর্বদা ভাই
করতে হবে আদায়,
তিনিই আল্লাহ কাউকে হাসায়
কাউকে আবার কাঁদায় ।

সুখে দুঃখে এজন্যই তো
থাকতে হবে রাজি,
প্রয়োজনে প্রভুর জন্য
রাখবে জীবন বাজি ।

দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম দেশ ব্রাজিল

মুহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম

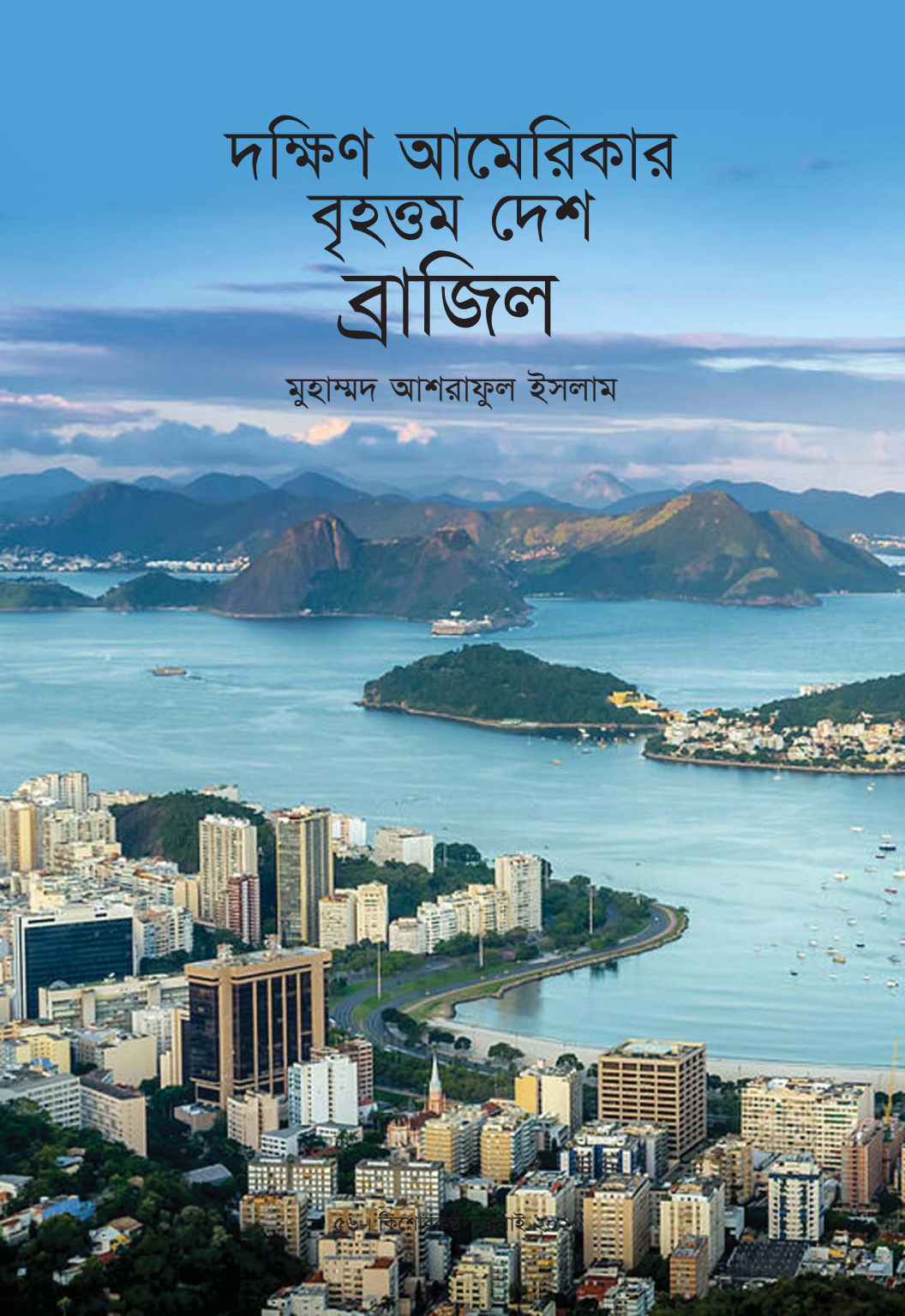

ব্রাজিল দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম দেশ। এ ছাড়াও জনসংখ্যা ও ভৌগোলিক আয়তনের দিক থেকে এটি বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম দেশ। ৮৫ লাখ ১৫ হাজার ৭৬৭ বর্গকিলোমিটার (৩২ লাখ ৮৭ হাজার ৯৫৬ বর্গমাইল) আয়তনের এই দেশটিতে বসবাসকৃত মানুষের সংখ্যা ২১ কোটি ১৭ লাখ ১৫ হাজার ৯৭৩ জন। এটি আমেরিকার একমাত্র পর্তুগিজভাষী দেশ এবং বিশ্বের সর্ববৃহৎ পর্তুগিজভাষী রাষ্ট্র।

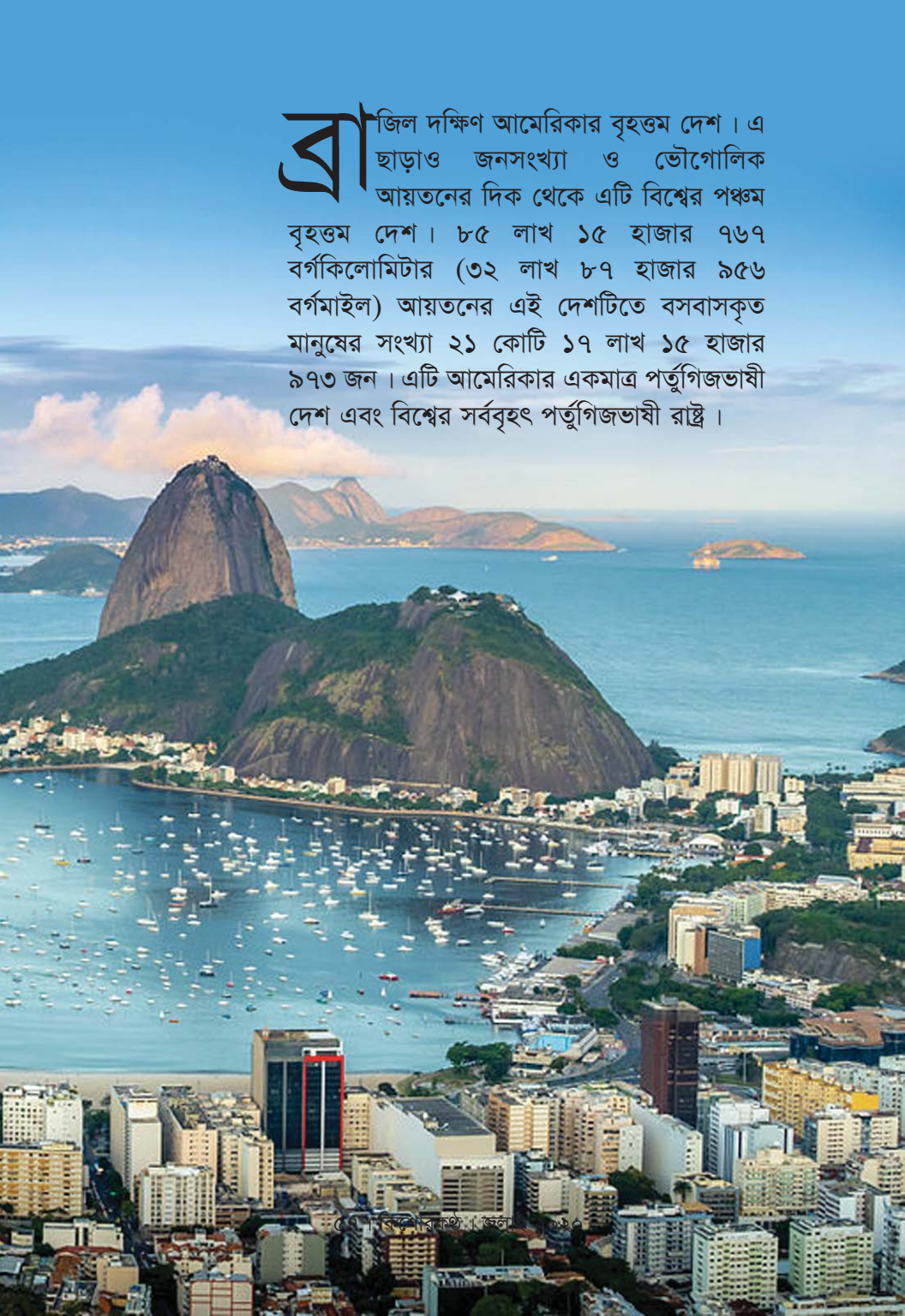

রিওডি জেনেইরোরাজ্যের সেরা ডস অরগাওস ন্যাশনাল পার্কের দৃশ্যপটে পর্বত এবং ডিডোডিডিয়াস চূড়া

এ দেশে জাতিগত গ্রুপের মধ্যে রয়েছে শ্বেতাঙ্গ ৪৭.৫ শতাংশ, মিশ্রবর্ণ ৪৩ শতাংশ, কৃষ্ণাঙ্গ ৮ শতাংশ, এশীয় ১ শতাংশ এবং আমেরিন্ডিয়ান ০.৫০ শতাংশ। প্রধান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে রয়েছে খ্রিষ্টান ৮৬.৮ শতাংশ, অধার্মিক ৮ শতাংশ, আধ্যাত্মিকতাবাদী ২ শতাংশ এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ৩.২ শতাংশ। ব্রাজিলে ইসলাম সংখ্যালঘু ধর্ম। আফ্রিকান দাস এবং লেবানিজ ও সিরীয় অভিবাসীদের মাধ্যমে এদেশে ইসলাম আসে। মুসলিম সংস্থাগুলোর দাবি অনুযায়ী ব্রাজিলে চার থেকে পাঁচ লাখ মুসলিম আছে, যা মোট জনসংখ্যার ১ শতাংশ।

ব্রাজিলের পূর্বভাগ আটলান্টিক মহাসাগর পরিবেষ্টিত। যার উপকূল রেখার দৈর্ঘ্য প্রায় ৭ হাজার ৪৯১ কিলোমিটার (৪ হাজার ৬৫৫ মাইল)। ব্রাজিলের উত্তরে রয়েছে ভেনিজুয়েলা, গায়ানা, সুরিনাম, ও ফ্রান্সের সামুদ্রিক দেপার্ত্যমঁ ফরাসি গায়ানা; উত্তর-পশ্চিমে কলম্বিয়া; পশ্চিমে বলিভিয়া ও পেরু; দক্ষিণ-পশ্চিমে আর্জেন্টিনা ও প্যারাগুয়ে এবং সর্ব-দক্ষিণে উরুগুয়ে। ব্রাজিলীয় সীমানায় আটলান্টিক মহাসাগরের বেশ কিছু দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত, যার মধ্যে রয়েছে ফের্নান্দু জিনরোনিঁয়া, রোকাস অ্যাটল, সেন্টপিটার ও সেন্ট পলরকস এবং ত্রিনিদাজি এ মার্চিভাঁজ। ব্রাজিলের সাথে চিলি ও ইকুয়েডর ব্যতীত দক্ষিণ আমেরিকার সব দেশেরই সীমান্ত-

সাওফ্রানসিসকো নদী দ্বারা খণ্ডিত সারজইপের ক্যানিডেসা ও ফ্রানসিসকো ক্যানিয়ন

সংযোগ রয়েছে।

১৫০০ সালে পর্তুগিজ অভিযাত্রী পেদ্রু আলভারেজ কাবরাউয়ের ব্রাজিলে এসে পৌঁছানোর পর থেকে ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্রাজিল ছিলো একটি পর্তুগিজ উপনিবেশ। ১৮১৫ সালে এটি যুক্তরাজ্য, পর্তুগাল ও আলগ্রেভিজের সাথে একত্রিত হয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা গঠন করে। মূলত ১৮০৮ সালেই ব্রাজিলের 'পর্তুগিজ উপনিবেশ' পরিচয়ে ফাটল ধরে। কারণ নেপোলিয়নের পর্তুগাল আক্রমণের রেশ ধরে পর্তুগিজ সাম্রাজ্যের কেন্দ্র লিসবন থেকে ব্রাজিলের রিওডিজানেইরুতে সরিয়ে নেওয়া হয়। ১৮২২ সালে ব্রাজিল পর্তুগালের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। প্রাথমিকভাবে এটি ব্রাজিলীয় সাম্রাজ্য হিসেবে সার্বভৌমত্ব অর্জন করলেও ১৮৮৯ সাল থেকে একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে শাসিত হয়ে আসছে।

১৮২৪ সালে ব্রাজিলের প্রথম সংবিধান পাস হয়। তখন থেকে দেশটিতে ফেডারেল প্রেসিডেন্সিয়াল সাংবিধানিক প্রজাতন্ত্র পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা চালু রয়েছে। এদেশের পার্লামেন্ট দুই কক্ষবিশিষ্ট। পার্লামেন্টের নাম ন্যাশনাল কংগ্রেস : উচ্চকক্ষ ফেডারেল সিনেট এবং নিম্নকক্ষ চেম্বার অব ডেপুটি জবা প্রতিনিধি পরিষদ। ব্রাজিলের প্রশাসনিক এলাকা একটি ফেডারেল ডিস্ট্রিক্ট, ২৬টি প্রদেশ ও ৫

ব্রাজিলের আর্থিক কেন্দ্র সাওপাওলো

হাজার ৫৬৪টি পৌরসভায় বিভক্ত। ব্রাজিলের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জাইরবল সোনারো এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট হামিলটন মৌরাও।

ব্রাজিল জাতিসংঘ, জি-২০, সিপিএলপি, লাতিন ইউনিয়ন, অর্গানাইজেশন অব ইবেরো-আমেরিকান স্টেটস, মার্কুসাউ ও ইউনিয়ন অফ সাউথ আমেরিকান ন্যাশন্স এবং উত্থানশীল অর্থনৈতিক শক্তির দেশগুলোর সংগঠন ব্রিকের সদস্য। ব্রাজিল জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশের দিক দিয়ে বিশ্বের অন্যতম প্রধান একটি দেশ হিসেবে বিবেচিত। ব্রাজিলে বিভিন্ন প্রকারের প্রকৃতি সংরক্ষণ কেন্দ্র ও অভয়ারণ্য বিদ্যমান। এছাড়াও দেশটি সমৃদ্ধ খনিজসম্পদের অধিকারী।

ব্রাজিলে বিভিন্ন জাতের লোক বাস করে। আদিবাসী আমেরিকান, পর্তুগিজ বসতি স্থাপক এবং আফ্রিকান দাসদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক এ দেশের জাতিসত্তাকে দিয়েছে বহুমুখীরূপ। ব্রাজিল দক্ষিণ আমেরিকার একমাত্র পর্তুগিজ উপনিবেশ। ১৬শ শতকে পর্তুগিজদের আগমনের আগে বহু আদিবাসী আমেরিকান দেশটির সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। ১৬শ শতকের মধ্যভাগে পর্তুগিজেরা কৃষিকাজের জন্য আফ্রিকা থেকে দাস নিয়ে আসা শুরু করে। এই তিন জাতির লোকেদের মিশ্রণ ব্রাজিলের সংস্কৃতি, বিশেষ করে এর স্থাপত্য ও সঙ্গীতে এমন এক ধরনের

মাটো গ্রোসোর রনডোনো পলিসের একটি সয়াবিন ক্ষেত। ব্রাজিল বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কৃষিপণ্য রফতানিকারক দেশ

স্বাতন্ত্র্য এনেছে কেবল ব্রাজিলেই যার দেখা মেলে। ১৯শ শতকের শেষ দিকে ও ২০শ শতকের গোড়ার দিকে ব্রাজিলে আগমনকারী অন্যান্য ইতালীয়, জার্মান, স্পেনীয়, আরব ও জাপানি অভিবাসীরাও ব্রাজিলের সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রেখেছে। মিশ্র সংস্কৃতির দেশ হলেও কিছু কিছু আফ্রিকান বংশোদ্ভূত ব্রাজিলীয়, ইউরোপ ও এশিয়া থেকে আগত অ-পর্তুগিজ অভিবাসী এবং আদিবাসী আমেরিকানদের অংশবিশেষ এখনও তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও রীতিনীতি ধরে রেখেছে। তবে পর্তুগিজ সংস্কৃতির প্রভাবই সবচেয়ে বেশি।

ব্রাজিল দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল ভাগের সবচেয়ে বেশি অংশ জুড়ে রয়েছে। সেই সাথে মহাদেশটির সবচেয়ে বেশি অংশটিও এই দেশটির আওতাধীন। এর সুবিশাল আকৃতি, জলবায়ু এবং খনিজসম্পদের প্রাচুর্য ব্রাজিলকে ভূ-তাত্ত্বিকভাবে একটি বৈচিত্র্যময় দেশে পরিণত করেছে।

বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম দেশ হিসেবে রাশিয়া, কানাডা, চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরেই ব্রাজিলের অবস্থান। কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পর এটি আমেরিকা মহাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম দেশ। দেশটিতে মোট তিনটি সময় অঞ্চল অবস্থিত। পশ্চিমের প্রদেশগুলো ইউটিসি-৪, পূর্বের প্রদেশগুলো ইউটিসি-৩ (এটি একই সাথে ব্রাজিলের সরকারি সময়) এবং আটলান্টিক দ্বীপপুঞ্জগুলো

ব্রাজিলের পি-৫১ তেলমঞ্চ

ইউটিসি-২ সময় অঞ্চলের অন্তর্গত।

ব্রাজিলে ভূ-সংস্থান যথেষ্ট বৈচিত্র্যময়। দেশটিতে পাহাড়, পর্বত, সমভূমি, উচ্চভূমি, চারণভূমি প্রভৃতি বৈচিত্র্যের ভূভাগ বিদ্যমান। এর ভূখণ্ডের বেশির ভাগের উচ্চতা ২০০ মিটার (৬৬০ ফুট) থেকে ৮০০ মিটার (২,৬০০ ফুট)-এর মধ্যে। দেশটির দক্ষিণ অর্ধাংশেই বেশির ভাগে উচ্চভূমি অবস্থিত। উত্তর-পশ্চিম অংশের সমভূমিগুলো ঢালু ও ভাঙা ভাঙা পাহাড় দিয়ে ঘেরা।

দেশটির দক্ষিণাঞ্চল বেশ অসমতল এবং বেশির ভাগ অঞ্চলই শৈলশ্রেণি ও পর্বতমালা বেষ্টিত। এ অঞ্চলের গড় উচ্চতা ১ হাজার ২০০ মিটার (৩ হাজার ৯০০ ফুট) পর্যন্ত। এসব পর্বতমালার মধ্যে রয়েছে মান্তিকিরা, এসপিনাসো পর্বত এবং সেরা দু মার। উত্তরে গুয়াইয়ানা উচ্চভূমি একটি বড় নিষ্কাশন বিভক্তির মাধ্যমে আমাজন অববাহিকার দিকে প্রবাহিত নদীগুলো থেকে ভেনিজুয়েলা থেকে উত্তর দিকের ওরিনোকো নদী ব্যবস্থায় এসে সমাপ্ত হওয়া নদীগুলোকে পৃথক করেছে। ব্রাজিলের সর্বোচ্চ পর্বত পিকু দা নেবলিনা, যার উচ্চতা প্রায় ২ হাজার ৯৯৪ মিটার (৯ হাজার ৮২৩ ফুট) এবং সর্বনিম্ন অঞ্চল আটলান্টিক মহাসাগর।

ব্রাজিলে ঘন ও বেশ জটিল নদীব্যবস্থা বিদ্যমান, যা বিশ্বের অন্যতম জটিল নদীব্যবস্থা। এদেশে মোট আটটি

পারনাম বুকোরফার নানডো ডিনরনহা দ্বীপপুঞ্জের সানচো উপসাগর।
এখানকার সৈকত বিশ্বে সবচেয়ে সুন্দর

নদী নিষ্কাশনব্যবস্থা অবস্থিত, যার সবগুলোই আটলান্টিক মহাসাগরে এসে শেষ হয়েছে। ব্রাজিলের উল্লেখযোগ্য নদীগুলোর মধ্যে রয়েছে আমাজন, যা বিশ্বের দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী ও নিষ্কাশিত পানির পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে বিশ্বের সবচেয়ে বড় নদী। এছাড়াও আছে পারান ও এর গুরুত্বপূর্ণ শাখা নদী ইগুয়াসু (ইগুয়াসু জলপ্রপাতসহ), নিগ্রো, সাউথ ফ্রান্সিসকু, শিজু, মেদেইরা ও টাপাজুস নদী।

আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল ও বিশ্ব ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, ব্রাজিলের অর্থনীতি দক্ষিণ আমেরিকার সর্ববৃহৎ, বাজার বিনিময়ের ভিত্তিতে বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম এবং ক্রয়ক্ষমতা সমতার ভিত্তিতে বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম অর্থনীতি। ব্রাজিলের অর্থনীতি একটি মিশ্র অর্থনীতি। দেশটির যথেষ্ট পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে, যা এর অর্থনীতির উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে। ব্রাজিলের বৃহৎ ও উন্নত কৃষি, খনি শিল্প, উৎপাদন ব্যবস্থা এবং সেবাখাত রয়েছে। সেই সাথে দেশটিতে শ্রমিকের প্রাচুর্যও বিদ্যমান। ব্রাজিলের মূল রপ্তানি পণ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে উড়োজাহাজ, ইলেকট্রনিক সামগ্রী, গাড়ি, ইথানল, টেক্সটাইল, পাদুকা, লৌহ আকরিক, ইস্পাত, কফি, কমলার রস, সয়াবিন ও কর্নড বিফ। এদেশের মুদ্রার নাম ব্রাজিলিয়ান রিয়াল।

২০০৭ সালে জাতীয় ইন্ডিয়ান ফাউন্ডেশনের এক প্রতিবেদনে ব্রাজিলে

ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা সীমান্তের পারানা নামক স্থানেই গুয়াজু জলপ্রপাত

৬৭টি ভিন্ন উপজাতীয় গোত্রের অবস্থান উল্লেখ করা হয়, যাদের সাথে কোনো রাষ্ট্রীয় যোগাযোগ নেই। ২০০৪ সালে যোগাযোগহীন এসব গোত্রের সংখ্যা ছিল ৪০। ব্রাজিলে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি অযোগাযোগকৃত মানুষ বাস করে বলে ধারণা করা হয়।

ব্রাজিলের বেশির ভাগ মানুষ দেশটির আদিবাসী জনগণ, পর্তুগিজ ঔপনিবেশক এবং আফ্রিকান দাসদের বংশোদ্ভূত। ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগিজদের আগমনের পর থেকে এই তিন জাতির মাঝে বৈবাহিক সম্পর্কের সৃষ্টি হতে থাকে, যা ব্রাজিলকে একটি বৈচিত্র্যময় জাতিসত্তা উপহার দিয়েছে। ব্রাজিলের বাদামি বর্ণের জনগোষ্ঠীকে পর্তুগিজ ভাষায় 'প্রাদু' বলা হয়। এদের মধ্যে বিভিন্ন ভাগের সৃষ্টি হয়েছে। এই ভাগগুলোর মধ্যে আছে শেতাঙ্গ ও ইন্ডিয়ান বংশোদ্ভূত 'কাবোক্লু', শেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ বংশোদ্ভূত 'মুলাতু' এবং কৃষ্ণাঙ্গ ও ইন্ডিয়ান বংশোদ্ভূত 'কাফুজু'। বেশির ভাগ কাবোক্লু জনগণ দেশটির উত্তর, উত্তর-পূর্ব, এবং মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলে বসবাস করে। গরিষ্ঠসংখ্যক মুলাতু জনগণ বাস করে বায়াও থেকে পারাইবা পর্যন্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চল ঘেঁষে চলে আসা পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চল, উত্তর মারানাউঁ, দক্ষিণ মিনাস জেরাইস এবং পূর্ব রিউডিজানেইরু অঞ্চলে। ১৯শ শতক থেকে অভিবাসীদের

বিশ্বের সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় বৃষ্টিবিধৌত জঙ্গল আমাজন জঙ্গল

জন্য ব্রাজিলের সীমান্ত উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। ফলে ১৮০৮ থেকে ১৯৭২ সালের মধ্যে ব্রাজিলে বিশ্বের ৬০টি দেশ থেকে প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষের আগমন ঘটে। এসব অভিবাসীর বেশির ভাগই এসেছিল পর্তুগাল, ইতালি, স্পেন, জার্মানি, জাপান এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে।

ফুটবল খেলাই ব্রাজিলের সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্রীড়া হিসেবে পরিচিত। ব্রাজিল জাতীয় ফুটবল দল ফিফা বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থানীয় দল হিসেবে চিহ্নিত। দলটি এ পর্যন্ত পাঁচবার বিশ্বকাপ জয়লাভ করেছে যা একটি রেকর্ড।

ভলিবল, বাস্কেটবল, অটো রেসিং এবং মার্শাল আর্ট ক্রীড়াও ব্যাপকভাবে দর্শকপ্রিয়। ব্রাজিলের পুরুষ জাতীয় ভলিবল দলটি ওয়ার্ল্ড লিগ, বিশ্ব ভলিবল গ্রাঁ চ্যাম্পিয়ন্স কাপ, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ এবং বিশ্বকাপের বর্তমানে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দল। ব্রাজিলের অন্যান্য খেলার মধ্যে রয়েছে- টেনিস, হ্যান্ডবল, সুইমিং ও জিমন্যাসটিক্স। ব্রাজিলে বেশ কিছু ক্রীড়ার উদ্ভব ঘটেছে। তন্মধ্যে-বিচ ভলিবল, ফুটসাল ও ফুটভলি অন্যতম। মার্শাল আর্টে ক্যাপোইরা, ভ্যালে টুডো এবং ব্রাজিলিয়ান জি-জিতসু ক্রীড়ার প্রচলন ঘটিয়েছে। অটো রেসিংয়ে এ পর্যন্ত তিনজন ব্রাজিলীয় ড্রাইভার ফর্মুলা ওয়ানে আটবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ অর্জন করেছে।

দাদুর উপদেশ

সিফাত হোসেন

মারিয়া ও ফারিয়া দুই বোন। মারিয়া বড়, ফারিয়া ছোট। ছোট্ট একটি পরিবার নিয়ে আব্দুল মালেক সাহেব ও রেহেনা বেগম শহরে বাস করেন। আব্দুল মালেক সাহেব ও রেহেনা বেগম দুই মেয়েকে নিয়ে অনেক সুখী। মারিয়া এসএসসি পরীক্ষার্থী। আর ফারিয়া জেএসসি পরীক্ষার্থী। সামনে তাদের দুই বোনের পরীক্ষা থাকায় রেহেনা বেগম তাদের দুই বোনকে সাংসারিক কোনো কাজকর্ম করতে দেন না। কিন্তু দুই বোন তো নাছোড়বান্দা! কোনোভাবেই তারা রেহেনা বেগমকে একাকী কাজ করতে দেয় না। তারা তার মাকে পরীক্ষার্থী অবস্থায় সাংসারিক কাজকর্মে সহযোগিতা করে। এতে রেহেনা বেগম অনেক খুশি হয়। কারণ, রেহেনা বেগম ও আব্দুল

মালেক সাহেবের দুটি মাত্র সন্তান। তারা দুই স্বামী-স্ত্রী দুই বোনকে অনেক আদর-ভালোবাসা দিয়ে বড় করেছেন। হঠাৎ করেই একদিন দুইবোন গ্রামে যাওয়ার জন্য বায়না ধরলো। কিন্তু রেহেনা বেগম ও আব্দুল মালেক সাহেব এতে রাজি হতে পারেনি। রাজি না থাকা সত্ত্বেও তাদের দুই বোনের কথা ফেলে দিতে পারছে না। অনেক চিন্তা-ভাবনা করার পর আব্দুল মালেক সাহেব ও রেহেনা বেগম সম্মত হলেন। তাঁরা দুইজন তাদের মেয়েদের কথা দিল যে, আগামী সপ্তায় তাঁরা গ্রামে যাবেন। এ কথা শুনে দুই বোন আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। এভাবে দিন ঘনিয়ে আসে আর তাদের আনন্দ বেড়ে যায়। আজ শুক্রবার, সকাল হলেই তাঁরা গ্রামের উদ্দেশে রওয়ানা হবে। তাঁরা দুই বোন রাতেই সবকিছু গোছাতে শুরু করলো...

সকাল হয়েছে। আব্দুল মালেক সাহেব ও রেহেনা বেগম ফজরের নামাজ পড়ল। কিছুক্ষণ পরেই দুই বোনকে ঘুম থেকে তুলল। ঘুম থেকে ওঠে দুই বোন গোসল সেরে রওয়ানা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলো। এদিকে আব্দুল মালেক সাহেব একটি সিএনজি ভাড়া করলেন। তাঁরা সবাই মিলে সিএনজিতে উঠলো। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পর তাঁরা গ্রামে গিয়ে পৌঁছল। তারা পৌঁছা মাত্রই তাদের দাদু লাঠির ওপর ভর দিয়েই তাদের কাছে এলেন। দুই বোন দাদুকে পেয়ে মহাখুশি। কারণ, অনেক দিন হলো দাদুর মুখে মজার মজার গল্প শোনে না। তারা যখন পৌঁছল তখন দুপুর। তারা সকলে মিলে দুপুরের খাবার খাওয়া শেষ করলো। দুই বোন দাদুর কাছে অনেকক্ষণ বসে থাকল। এভাবে প্রায় ছয় দিন চলে গেল। একদিন রাতে খাবার খাওয়া শেষ করে দাদুর কাছে গল্প শোনার জন্য বায়না ধরলো। তখন তাদের দাদু বললেন, শোন মেয়েরা! আজ তোমাদের গল্প শোনাবো না। আমি তোমাদের কিছু উপদেশবাণী শোনাবো। তখন দুই বোন বলল, আচ্ছা দাদু শোনাও। তখন তাদের দাদু বলতে শুরু করলেন,

তোমরা নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে।

কবিরা ও বিভিন্ন ধরনের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করবে।

পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।

কখনো মিথ্যা কথা বলবে না।

পর্দা করে চলাফেরা করবে।

ইসলামের প্রত্যেকটা বিধান মেনে চলার চেষ্টা করবে।

কিছুক্ষণ পর তাদের মা ডাক দিলেন। কিন্তু তারা দু'জন এক ধ্যানে দাদুর উপদেশবাণী শুনছিল। তখন তাদের দাদু বললেন যাও, তোমাদের আম্মু ডাকছে। আগামীকাল তোমরা তো আবার শহরে চলে যাবে। তাই তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ উক্ত উপদেশ মেনে চলার চেষ্টা করবে। দুই বোন একসাথে দাদুকে কথা দিয়ে মার ডাকে সাড়া দিল। রেহেনা বেগম দুই বোনকে রাতের খাবার খাওয়াইয়া ঘুমোতে বললেন। সকাল বেলা উঠেই তারা শহরের উদ্দেশে রওয়ানা দিলেন।

লক্ষ বছর পর
ফিরে এলো যে পাখি

জাহিদ ইকবাল

পাখিদের কলকাকলিতে পরিবেশ মুখরিত হয়। পাখি আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। পৃথিবীতে চেনা-অচেনা অনেক পাখি রয়েছে।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করলেও আমাদের অনেক পরিচিত পাখি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তেমনি একটি পাখি এলডেবরা হোয়াইট থ্রোটেড রেল। অবাক করা বিষয় হলো প্রায় এক লাখ বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া এলডেবরা হোয়াইট থ্রোটেড রেল পাখি আবার প্রকৃতিতে ফিরে এসেছে।

ভারত মহাসাগরের ওপরে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রবাল দ্বীপ, আলডাবরা। এ দ্বীপে এক সময় বাস ছিল 'হোয়াইট থ্রোটেড রেল' পাখির। প্রায় ১ লাখ ৩৬ হাজার বছর আগে সমুদ্রের তলদেশে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় দ্বীপটি। বাসস্থান খুইয়ে হারিয়ে গিয়েছিল আকারে মুরগির মতো পাখিটিও। কিন্তু প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের দাবি, আবার ফিরে এসেছে বিলুপ্ত হওয়া সেই 'হোয়াইট থ্রোটেড রেল' পাখি।

তবে এ ফিরে আসার কাহিনীও বিচিত্র। এ নিয়ে দ্বিতীয়বার তারা অবলুপ্তির গহ্বর থেকে ফিরে এলো। বিশেষজ্ঞদের দাবি, লাখো বছর আগের ওই ঘটনার কয়েক হাজার বছর পরে পাখিটি আবার ফিরে এসেছিল। সে সময় সমুদ্রের পানি নেমে গিয়েছিল। পানি নামতেই দ্বীপটি আবার জেগে ওঠে। আর তখনই পাখিটি ফের রাজ্যপাট গড়ে তোলে ওই প্রবাল দ্বীপে।

এ দুই ঘটনার আগে পরের জীবাশ্ম খুঁজে পেয়েছিলেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে এখন তারা বলছেন, 'আলডাবরা দ্বীপে পাখিটি এখনও রয়েছে।'

বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, একে 'ইটেরেটিভ ইভোলিউশন' বলে। অর্থাৎ

কোনও প্রাণীর উত্তরসূরিদের মধ্যে কোনও একটি প্রজাতির একাধিক বিবর্তন ঘটে এবং ইতিহাসের বিভিন্ন সময় ফিরে ফিরে আসে তারা। অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে দেখা গেলেও 'রেল' বা মাটিতে বসবাসকারী ছোট বা মাঝারি মাপের পাখিদের মধ্যে এমন নজির এই প্রথম। পাখিদের মধ্যেই এটি বেশ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

জানা যায় রেল পরিবারের পাখিদের পূর্বপুরুষের বাস ছিল পূর্ব আফ্রিকার উপকূল থেকে ৪০০ কিলোমিটার দূরে ভারত মহাসাগরের ম্যাদাগাস্কার দ্বীপে। এক সময় এদের সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে, এরা দ্বীপ ছেড়ে অন্যত্র পাড়ি দেয়। কেউ উত্তরের দিকে উড়ে যায়, কেউ দক্ষিণে। কিন্তু এরা কেউই তেমন উড়তে পারত না। ফলে লম্বা রাস্তা পাড়ি দিতে গিয়ে অনেকেই ভারত মহাসাগরে ডুবে যায়।

যারা পশ্চিমে যায়, তারা আফ্রিকার মূল ভূখণ্ডে পৌঁছায়। কিন্তু অচেনা-অজানা জায়গায় গিয়ে বিপদে পড়ে। প্রাণ হারায় অধিকাংশই। তবে কারও কারও ভাগ্য ভালো ছিল। তারা মরিশাস, রিইউনিয়ন, আলডাবরা পৌঁছায় এবং সেখানে রাজ্যপাট গড়ে তোলে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা ওড়ার ক্ষমতাটাই হারিয়ে ফেলে। কারণ ওই সব দ্বীপে তাদের ওড়ার প্রয়োজন পড়ত না।

ফলে দ্বীপেই বন্দি হয়ে পড়ে। তাই দ্বীপ যখন সমুদ্রের তলদেশে ডুবতে থাকে, তারা আর পালানোর সুযোগ পায়নি। তত দিনে তারা আর একটুও উড়তে পারে না। ফলে দ্বীপের সঙ্গেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তারা। ঠিক যা ঘটেছিল, ডোডো পাখিদের ক্ষেত্রে। কিন্তু ডোডো যা পারেনি, তাই করে দেখিয়েছে 'হোয়াইট-থ্রোটেড রেল'।

মারটিলের কথায়, ভারত মহাসাগরের ওপরে আলডাবরাই একমাত্র দ্বীপ, যেখানে এমন জীবাশ্ম রয়েছে, যা অবলুপ্তির প্রমাণ দেয় এবং দেখিয়ে দেয় সেখান থেকেও ফিরে আসা যায়।

প্রায় এক লক্ষ বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া এলডেবরা হোয়াইট থ্রোটেড রেল পাখি আবার প্রকৃতিতে ফিরে এসেছে। সমুদ্রসীমার উচ্চতা বৃদ্ধি এই পাখির প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কারণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু বর্তমানে আবার এই উড়তে অক্ষম পাখিটির উপস্থিতি

প্রায় এক লক্ষ বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া এলডেবরা হোয়াইট থ্রোটেড রেল পাখি আবার প্রকৃতিতে ফিরে এসেছে। সমুদ্রসীমার উচ্চতা বৃদ্ধি এই পাখির প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কারণ বলে মনে করা হয়

বিজ্ঞানীদের ভাবনায় ফেলে দিয়েছে, কেন এবং কিভাবে এই পাখিটি এত বছর পরে ফিরে এলো!

জুলজিক্যাল জার্নাল অব লিনিয়ান সোসাইটির গবেষণা মতে, এলডেবরা পাখির এই ফিরে আসা "পুনরাবৃত্তি বিবর্তন" এর ফলাফল।

কোন পাখির পূর্বপুরুষ বিলুপ্ত হয়ে গেলেও, সেই বিলুপ্ত পূর্বপুরুষের ডিএনএ কিন্তু পরবর্তী প্রজাতিতে রয়ে যায়। উপযুক্ত পরিবেশ পেলে সেই পুরনো ডিএনএ আবার নতুনভাবে ফিরে আসতে পারে। কাজেই প্রায় একই রকম প্রজাতি থেকে সময়ের সাথে সাথে একাধিক এবং কিছুটা বিবর্তিত নতুন উত্তরসূরির আবির্ভাব ঘটা সম্ভব।

কিন্তু তার মানে এই নয় যে এই বিবর্তনের ফলে ডাইনোসর এবং লোমশ ম্যামথ যেকোন সময় ফিরে আসবে। এই বৈজ্ঞানিক ঘটনা শুধুমাত্র সেইসব প্রজাতির ক্ষেত্রেই ঘটে যারা প্রায় তাদের পূর্বপুরুষের মতই দেখতে।

পুনরাবৃত্তি বিবর্তন এর আগে অন্যান্য প্রজাতি যেমন– কাছিমের ক্ষেত্রে লক্ষ করা গেলেও পাখিদের ক্ষেত্রে এই প্রথম।

শুধুমাত্র এলডেবরা পাখিরই ভারত মহাসাগর অঞ্চলের মহাসাগরীয় দ্বীপের সবচেয়ে পুরনো জীবাশ্ম রেকর্ড রয়েছে, যা থেকে এই পাখির বিলুপ্ত হওয়ার এবং পুনরায় ফিরে আসার পিছনে সমুদ্র সীমার উচ্চতা পরিবর্তনের প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া যায় যা একটি বিস্ময়কর ঘটনা।

বৃষ্টির ছড়া

ফরিদ আহমেদ ফরায়েজী

রিমঝিমা ঝিম বৃষ্টি পড়ে টিনের চালে
বৃষ্টি পড়ে অঝর ঝরে নায়ের পালে ।
টুপটাপা টুপ বৃষ্টি পড়ে গাছের পাতায়
বৃষ্টি পড়ে উঠোন কোণায় ব্যাঙের ছাতায় ।
ঝিনঝিনা ঝিন বৃষ্টি পড়ে মিষ্টি সুরে
ইলশেগুঁড়ি নেয় কেড়ে নেয় দৃষ্টি দূরে ।
রুমঝুমা ঝুম বৃষ্টি পড়ে বাজার হাটে
টাপুর টুপুর ছন্দ তোলে পুকুর ঘাটে ।
বৃষ্টি নিয়ে মিষ্টি ছড়া পড়ছে খুকু
পাতার ফাঁকে কাক ভেজা ঐ দুটো ঘুঘু ।
শালিকগুলো ঝাপটে ডানা বিলের জলে
শাপলা-শালুক খুশির বানে ঝিলের জলে ।

ছড়ার সাধ

আলী ওয়াজেদ

ছড়া হোক বৃষ্টির
ছড়া হোক জমিনের
নব নব সৃষ্টির ।

ছড়া হোক বন্যার
ছড়া হোক ফুল-বাস
আইবুড়ি কন্যার ।

ছড়া হোক বাদলের
ছড়া হোক জনতার
জনপদে-আদলের ।

ছড়া হোক মুক্তির
ছড়া হোক জীবনের
সমাধান-শক্তির ।

ছড়া হোক প্রাণের
ছড়া হোক জীবনের
ফুল-ফোটা বাগানের ।

ছড়া হোক ভালোর
ছড়া হোক কালো-তাড়া
সোনালি সে আলোর ।

খলিল স্যারের স্মৃতি

মাহাথির আরাফাত

খলিল স্যার আমাদের ক্লাস টিচার। বাংলা পড়ান। লম্বা চওড়া মানুষ। খুবই নিরীহ গোছের। অন্য স্যারদের মতো উনি ধমক দেন না, চোখ গরম করে তাকান না, বেয়াদবি করলে বেতান না। এমনকি হোমওয়ার্কও না করলে তিনি কিছু বলেন না। এমন স্যার পাওয়া আসলে ভাগ্যের ব্যাপার।

গত বছর পরীক্ষায় 'তোমার প্রিয় শিক্ষক' রচনা এলে সবাই লিখেছিল খলিল স্যারকে নিয়ে। তিনি আমাদের খুবই প্রিয় একজন ব্যক্তি।

আজকে উনি আমাদের ক্লাসে এলেন। উনার পারফিউমের গন্ধ আমাদের নাকে লাগল। এই গন্ধটা আমাদের কাছে খুবই পরিচিত। স্যার রোল কল শেষ করে বললেন, আজ ক্লাস করাবো না। গল্প করবো। কারণ আজকে আমার একটা ছোটবেলার স্মৃতি মনে পড়েছে। তোমরা কি সবাই শুনবে?

স্যারের শৈশব কেটেছে গ্রামে। তিনি প্রায়ই আমাদের গল্প শোনান। কাল্পনিক

গল্প না। একেবারে বাস্তব গল্প, যা শুনতে খুবই ভালো লাগে। তাই সবাই চেঁচিয়ে জবাব দিল, জি স্যার।

স্যার চেয়ারে বসলেন। তারপর গল্প শুরু করলেন, আমি তখন ক্লাস ফাইভে পড়ি। হাড় কাঁপানো শীত ছিল তখন। আমাদের বাজারে সেদিন জসিম কাকার দোকানে হালখাতা ছিল। ওই হালখাতায় আমাদের সাত শ' টাকা দেওয়ার কথা। আমার আব্বার ছিল জ্বর। বড় দুই ভাই বাড়িতে ছিল না। যে কারণে আমাকে যেতে হয়েছিল হালখাতা করতে। দুইটি রসগোল্লা খেয়ে যে-ই না বাড়ি ফিরছি তখন লতিফ নানার সাথে দেখা। আপন নানা না। নানার আপন ভাই। উনাকে দেখে ভালো লাগল। নানা আমাকে বললেন যে আজকে রাতে মঞ্চ নাটক হবে। নবাব সিরাজউদ্দৌলা। যে কারণে আমাকে থাকতে বললেন। আমিও উনার কথামতো নাটক দেখতে বসে গেলাম। রাত দুইটার সময় নাটক শেষ হলো। নানা অনেক জোরাজুরি করলেন উনার সঙ্গে যেতে। কিন্তু আমি রাজি হলাম না। তারপর বাজার পার হয়ে অনেকটা চলে এলাম। জঙ্গলটা পার হলাম ভয়ে ভয়ে। আমার সাথে কোনো টর্চলাইট ছিল না। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। এত রাত হয়ে গেছে এখনো আমি বাড়িতে যাইনি। মনে হচ্ছে বাড়িতে গেলেই উত্তম মধ্যম কিছু খেতে হবে। তারপর নদীর ঘাটে এলাম। এপারে শুধু একটা নৌকা। নদীতে আড়াআড়িভাবে দড়ি টানানো থাকত। দড়ি ধরে টেনে টেনে নৌকা চালানো হতো। আমি নৌকায় উঠে দড়িতে হাত রাখলাম। নৌকায় ছিল অনেক পানি। আমি তা খেয়াল করিনি। মাঝ নদীতে আসতেই নৌকা ডুবে গেল। আমি পাতলা একটা ছেলে, আমাকে নিয়ে নৌকা কিভাবে ডুবে যায়? এ হতেই পারে না। আমার গায়ে ছিল শীতের ভারি ভারি কাপড়। যে কারণে সাঁতরাতে কষ্ট হচ্ছিল। মাঝ নদী থেকে সাঁতরিয়ে ওপারে যাওয়া অনেক দমের ব্যাপার। তাছাড়া আমি তখন ভয় পাচ্ছিলাম। নৌকাটা কি ভূতে ডুবালো নাকি? এখন কি তাহলে আমাকে নদীর পানিতে ডুবিয়ে মারবে নাকি? আমি ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম। এত রাতে তো কোনো মানুষই জেগে নেই যে ডাকলে আসবে। আমি ভাবতে লাগলাম নানার সাথে চলে গেলেই বরং ভালো হতো।

অনেকক্ষণ ধরে সাঁতরাচ্ছি, এখনো মাটি পাচ্ছি না কেন? এদিকে আমার ভয়ে জান বেরিয়ে যাচ্ছে। হে আল্লাহ রক্ষা করো। হঠাৎ কি মনে করে যেন পা ফেললাম মাটিতে। দেখি হাঁটু পানি। ধূর! কিছুক্ষণ ধরে তাহলে হাঁটু পানিতে সাঁতার কাটছি। আর একটু হলে তো ভয়ে মরেই যেতাম। তারপর পাড়ে এসে উঠলাম। শীতে শরীর কাঁপছে। আরও অনেকটা পথ এখন হেঁটে যেতে হবে। আমি হাঁটছিলাম আর রাতকানা রোগীর মতো সব অন্ধকার দেখছিলাম।

দুই.

স্যার থামলেন এবং হাত ঘড়ির দিকে তাকালেন। ফার্স্ট বেঞ্চে বসা রাফিন বলল, তারপর কী হলো স্যার?

তারপর আমি যখন বাড়ি গেলাম, সবাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে যেন আমি কোনো বড় অপরাধ করেছি। মজার ব্যাপারটা হলো আমি কারও প্রশ্নের উত্তর

দিচ্ছিলাম না। একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছিলাম। তাই কেউ আমাকে বেশি ঘাঁটাইনি। সকালে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর উঠল। দাদা ফকির ডেকে আনলেন এবং আমার সারা শরীরে ফুঁ দিল সেই ফকির। ফকির বলল যে আমার গায়ে কালা বাতাস লেগেছে।

রাতুল বলল, স্যার, কালা বাতাস কী?

কালা বাতাস মানে ভূত প্রেতের নজর পড়া। আগেকার দিনে এসব কুসংস্কার চালু ছিল। আমার গ্রামের নদীটার কথা এখন কিছু বলি তোমাদের। ওই নদী আমার অস্তিত্বে মিশে আছে। কত সাঁতার কেটেছি। কত মাছ ধরেছি। আহা! আমার নদী। দুঃখের বিষয় নদীটা এখন মৃত।

জুনায়েদ বলল, নদী মৃত মানে কী স্যার?

নদী মৃত মানে এখন নদীতে বেশি পানি হয় না, বড় বড় নৌকা চলে না। যে নদী আগে আমরা নৌকা করে পার হতাম, সেই নদী এখন গরু-ছাগল অনায়াসে পার হয়ে যায়।

সাথি বলল, স্যার, আমরা তো ভালো করে নদীই দেখিনি।

সমস্যা নেই, এবারের পিকনিকটা আমরা কোনো নদীর পাড়ে করব। তখন বুঝতে পারবে নদী কী জিনিস। নদীর পাড়ে গেলে যে কারও মন ভালো হয়ে যায়। মনে হয় যেন নদীর কোনো পাওয়ার আছে।

ক্লাসের সবাই এভারেস্ট বিজয়ীর হাসি দিল। তারপর খলিল স্যার বললেন, এখন এক কাজ করো 'বাংলাদেশের নদ-নদী' রচনাটা আগামীকাল শিখে এসো। ঠিক আছে? কেউ মুখস্থ করো না যেন।

কিশোরকণ্ঠের গ্রাহক হতে চাও?

সর্বাধিক প্রচারিত শিশুকিশোর মাসিক পত্রিকা কিশোরকণ্ঠ পৌঁছে যাবে তোমার নিকটস্থ পোস্ট অফিসে।

তোমার ঠিকানা লিখে পাঠিয়ে দাও আমাদের ইনবক্সে

তুমি যা লিখে পাঠাবে-

নাম, পিতার নাম, গ্রাম, পোস্ট অফিস, পোস্টকোড, থানা, জেলা, মোবাইল নম্বর এবং তুমি কত কপি পত্রিকা নিবে।

ইমেইলেও তোমার ঠিকানা পাঠাতে পারো।
E-mail: kishorkantha@yahoo.com

http://www.facebook.com/kishorkanthabd

প্রাণ ফিরুক মাঠে

আবু আবদুল্লাহ

এই লেখা যখন লিখছি ততদিনে ক্রীড়াঙ্গনে কিছুটা আশার আলো ফুটতে শুরু করেছে। নিকশ কালো অন্ধকার সরিয়ে কিছুটা হলেও আলোর রেখা দেখা দিয়েছে। এর আগে টানা প্রায় তিন মাস বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গন ছিলো প্রাণহীন। রেফারির বাঁশি বাজেনি, গো...ল বলে ভাষ্যকারের উত্তেজিত কণ্ঠ শোনা যায়নি। ছিল না বোলার-ফিল্ডারদের 'হাউ ওয়াজ দ্যাট' চিৎকার। ছিলো না গ্যালারির দর্শক গর্জন। টেলিভিশনে ছিলো না লাইভ খেলা সম্প্রচার। শুধু ক্রীড়াঙ্গন নয়, পুরো বিশ্বব্যবস্থাই থমকে গিয়েছিল করোনাভাইরাসের মহামারীতে। প্রতিদিন অসুস্থ হয়ে পড়া মানুষ আর লাশের সংখ্যা গোনাই হয়ে উঠেছিল সবচেয়ে বড় খবর। তবে এটি যেহেতু খেলার পাতা, আমরা তাই শুধু ক্রীড়াঙ্গনের বিষয়গুলোই নিয়ে আলোচনা করবো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ক্রীড়াঙ্গনে এমন দুর্যোগ আর আসেনি। একসাথে সব খেলাধুলা বন্ধ হয়ে যাওয়া আগে কখনো দেখেননি এখনকার দর্শকরা। চীনের উহান থেকে ছড়িয়ে পড়া এই সংক্রামক ব্যাধি সেটাই দেখালো বিশ্বকে। চীন

থেকে করোনাভাইরাস ইউরোপে আঘাত হানার পরই সারা বিশ্ব আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে করোনা আঘাত হানে ক্রীড়াঙ্গনে। হাইপ্রোফাইল খেলোয়াড়দের মাঝে ইতালীয় ক্লাব জুভেন্টাস ও ইতালি জাতীয় দলের ডিফেন্ডার দানিয়েল রোগানি প্রথম আক্রান্ত হন করোনাভাইরাসে। ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোসহ ক্লাবটির সব খেলোয়াড়কে পাঠানো হয় হোম কোয়ারেন্টিনে; কিন্তু তাতেও রক্ষা হয়নি। কয়েকদিন পর ব্লেস মাতুইদির শরীরে পাওয়া যায় এই ভাইরাস। তবে সবচেয়ে বেশি ভুগতে হয়েছে জুভেন্টাসের আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার পাওলো দিবালাকে। চতুর্থবার টেস্ট করেও দিবালার শরীরে করোনা পাওয়া যায়। পঞ্চমবারে গিয়ে তিনি করোনা নেগেটিভ হন। প্রায় এক মাস করোনার সাথে লড়াই করেছেন দিবালা। তবে শেষ পর্যন্ত করোনাকে কিকআউট করতে পেরেছেন সেটিই স্বস্তির খবর। ইতালীয় ফুটবল লিগ 'সিরি আ' ততদিনে স্থগিত হয়ে গেছে।

তবে ক্রীড়াঙ্গনে করোনাভাইরাসের সবচেয়ে বড় ধাক্কাটি আসে মার্চের ১৩ তারিখে। ততদিনে ইতালির পর ইংল্যান্ড ও স্পেনেও হানা দিয়েছে করোনা মহামারী। ওই দিন খবর আসে ইংল্যান্ডের ফুটবল ক্লাব আর্সেনাল এফসির কোচ মিকেল আর্তেতা ও চেলসির স্ট্রাইকার হাডসন ওডিও করোনা পজিটিভ। এই খবরটিতেই মূলত ক্রীড়াঙ্গনের কর্মকর্তাদের টনক নড়ে। তখন শ্রীলঙ্কা সফরে ছিলো ইংল্যান্ড ক্রিকেট দল। লঙ্কান বোর্ড প্রেসিডেন্ট একাদশের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের প্রস্তুতি ম্যাচ চলছিলো গলে স্টেডিয়ামে; কিন্তু প্রস্তুতি ম্যাচের দ্বিতীয় দিন খেলার মাঝপথেই মাঠ ছেড়ে হোটেলে ফেরে ইংল্যান্ড দল। সেখান থেকে সোজা বিমানবন্দরে গিয়ে ইংল্যান্ডের বিমানে

দর্শকশূন্য গ্যালারিতে খেলা চলছে

ওঠে জো রুটের দল।

সেদিনই ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ফুটবল স্থগিতের ঘোষণা দেয় লিগ কর্তৃপক্ষ। ওদিকে ভারত সফররত দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট দল তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজের একটি ম্যাচ খেলেই সিরিজ বাতিল করে দেশে ফেরে। পিছিয়ে দেওয়া হয় ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল), পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) বিদেশী ক্রিকেটারদের ছুটি দেওয়া হয়। দুই-তিন দিন পরে অবশ্য আইপিএল, পিএসএল দুটোই স্থগিত হয়ে যায়। পরবর্তী কয়েক দিনে সারা বিশ্বের সব ক্রীড়া ইভেন্ট বন্ধ ঘোষণা করা হয়। নিউজিল্যান্ড দল দেশে ফিরে যায় অস্ট্রেলিয়া থেকে। ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট, বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ফুটবল, মহিলা ফুটবল লিগসহ সব খেলা স্থগিত হয়ে যায়। স্থগিত হয় টাইগারদের পাকিস্তান সফর।

> দর্শকহীন গ্যালারি মানে প্রাণহীন ক্রীড়া আসর। কারণ দর্শকরাই খেলার প্রাণ

তবে মে মাসের মাঝামাঝিতে এসে পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতির আভাস দেখা দেয়। টানা লকডাউনে ইউরোপে কমে আসে সংক্রমণের হার (যদিও বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে তখনও বাড়তে থাকে)। সংক্রমণ কমে আসায় আশাবাদী হয় ইউরোপের ক্রীড়াঙ্গন। তারচেয়েও বড় কথা মানুষ বুঝতে পারে যে, এই করোনাভাইরাসের সাথে মানিয়ে চলা শিখতে হবে তাদেরকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়ে দেয়, করোনাভাইরাস নির্মূল করা সম্ভব নয়। ভ্যাকসিন আবিষ্কারের চেষ্টা চললেও সেটি অনেক সময় সাপেক্ষ; কিন্তু ততদিন তো আর জনজীবন লকডাউন করে রাখা সম্ভব নয়। তাতে ধসে পড়বে বিশ্ব অর্থনীতি। তাই করোনাকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রেখে জীবনযাত্রা চালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি মেনে নেয় সবাই। ক্রীড়াঙ্গনের কর্মকর্তারাও সেটি উপলব্ধি করেন।

এরপর সবার আগে মাঠে গড়ায় জার্মানির সর্বোচ্চ ফুটবল লিগ বুন্দেসলিগা। তবে অনেক বিধিনিষেধের বেড়াজালে শুরু হয় লিগ। খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফ ও কর্মকর্তাদের প্রত্যেকের করোনা টেস্ট করানো হয়। অনুশীলনে নানা কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। মাঠে দর্শকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকে। অর্থাৎ খালি গ্যালারিতেই শুরু হয় বুন্দেসলিগা। বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি দর্শক দুই মাস পর টিভিতে লাইভ খেলা দেখার সুযোগ পান।

জার্মানির লিগ শুরু হওয়া দেখে আশাবাদী হয় ইংল্যান্ড ও স্পেনের ফুটবল কর্তৃপক্ষ। শুরুতে খেলোয়াড়দের পৃথক

জার্মানির বুন্দেসলিগায় বায়ার্ন মিউনিখ ও বরুশিয়া ডর্টমুন্ড ম্যাচের একটি দৃশ্য, পেছনে দর্শকশূন্য গ্যালারি

অনুশীলন, এরপর ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ অনুশীলনের অনুমতি দেওয়া হয়। জুনের মাঝামাঝি ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ও স্প্যানিশ লা লিগা শুরুর তারিখ ঠিক করা হয়। অস্ট্রেলিয়ায় ঘরোয়া ক্রিকেট শুরুর পরিকল্পনা হয়। আর আগস্টে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার তারিখ ঘোষণা করে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। পাকিস্তান দল ইংল্যান্ড সফরের পরিকল্পনা করে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইংল্যান্ডের সাথে সিরিজ খেলার আলোচনা শুরু করে। সব কিছু মিলে তাই ক্রীড়াঙ্গনে আশার আলো দেখা দেয়। করোনাকে এড়িয়েই খেলা মাঠে ফেরানোর বিষয়ে উদ্যোগী হন ক্রীড়াঙ্গনের কর্মকর্তারা। দর্শকরাও দেখতে শুরু করেন আশার আলো। শুরুতে অবশ্য সব খেলাই দর্শকশূন্য গ্যালারিতে হওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়।

দর্শকহীন গ্যালারি মানে প্রাণহীন ক্রীড়া আসর। কারণ দর্শকরাই খেলার প্রাণ। যাদের উদ্দেশে খেলা হবে তারাই যদি গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে প্রিয় দলের পক্ষে চিৎকার করে গলা ফাটাতে না পারেন, প্রিয় তারকাদের উৎসাহ দিতে না পারেন- তবে সেই খেলা নিষ্প্রাণ। তবে করোনা মহামারীকে তো আর অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো' ধরে নিয়েই মাঠে খেলা ফেরানোর চেষ্টা করা হয়। দর্শকরা তবুও তো ঘরে বসে টিভিতে খেলা উপভোগ করতে পারবেন! তাতে কিছুটা হলেও তো তৃপ্তি পাওয়ার সুযোগ থাকবে। এই লেখা তোমাদের হাতে পৌঁছতে পৌঁছতে করোনাকে পেছনে ফেলে যেন পুরো মাত্রায় শুরু হয় সব ক্রীড়া ইভেন্ট। প্রাণ ফিরে আসুক মাঠে, সেটাই প্রত্যাশা।

করতে শেখো কাজ

মুহাম্মদ ইমদাদ হোসেন

নিজের পায়ে চলতে শেখা
সবচে বড় সুখ
নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গেলে
থাকবে না যে দুখ।

কারও কাছে হাত না পেতে
করতে শেখো কাজ
করতে কাজ পেয়ো না কভু
একটুখানি লাজ।

ছোট হলেও কাজটা তুমি
করবে প্রতিদিন
কাজ করলে জীবন মাঝে
বাজে সুখের বীণ।

অলস জনের দুখটা বেশি
লোকে মন্দ কয়
কাজ করলে মানটা বাড়ে
জীবন সফল হয়।

হালাল পথে কাজটা করো
সফেদ করো মন
চাইলে খোদা দিতে পারেন
টাকা-পয়সা ধন।

করোনা

আহমদ হোসাইন জসিম

আল্লাহ যখন দিলেন ধরায়
সর্দি কাশি জ্বর,
সবাই তখন বন্দি হলো
নিজের আপন ঘর।

শহর নগর সবই ফাঁকা
নেইতো কোথাও কেউ,
সাবধানী হোন, একা থাকুন,
আতঙ্কের এক ঢেউ।

কতো বেদ্বীন আসছে দ্বীনে
হচ্ছে ভালো বেশ,
অর্থের অভাব দিচ্ছে দেখা
অনেক রাজার দেশ।

বন্দি ঘরে কৃষক শ্রমিক
নিচ্ছে না কেউ খোঁজ,
কাজ হাতে নেই গরিব লোকের
কেমনে করবে ভোজ?

প্রভাবশালী আছেন যারা
একটু পাশে যান,
এই অভাবী লোকের হাতে
করেন কিছু দান।

পিশাচ কাহিনী

গোলাম রাব্বি রাকিব

প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে বাসটা থেমে গেলো। সামনের দিকে কয়েকটা মেয়ে বসেছে। ওরা চিৎকার করে উঠলো। আমি হেডফোনটা ঘাড়ে নামিয়ে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করলাম। জানালার পাশে বসে থাকা ভদ্রলোক আনমনে বললেন- 'কী হলো?'

আমি উত্তর দিতে যাবো, ঠিক তখনই লোডশেডিং। বাসের ভেতর সব আলো নিভে গেলো।

অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না। পাশের ভদ্রলোক এবার মোবাইলের আলো জ্বাললেন। দেখলাম 11.50 PM বাজে। তিনি আবার বললেন- 'কী হলো?'

কী যে হলো, সেটা তো আমারও জিজ্ঞাসা। কিন্তু সেটা কে জানাবে?

ইচ্ছে করছে উঠে গিয়ে জেনে আসতে– ঘটনা কী। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই ভারী একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো দূর থেকে- "আপনারা যার যার স্থানে বসে থাকুন। কেউ নড়বেন না। ঘাবড়ানোর কিছু নেই। এক্ষুনি কারেন্ট চলে আসবে। গাড়ির পিছনের একটা চাকা কোনো কারণে ড্যামেজ হয়েছে। ওটা পাল্টাতে কিছুক্ষণ সময় লাগবে, এরপরই গাড়ি ছেড়ে দেওয়া হবে।

যাত্রাকালীন এই সাময়িক গোলযোগের কারণে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।"

কথার হেরফের হলো না। কারেন্ট তখনই চলে এলো। বাসের ভেতরটাও শান্ত হলো। আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। কিন্তু গুমোট অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখলাম না। আস্তে আস্তে দৃষ্টি সয়ে এলে বুঝলাম, বাইরে ঘন জঙ্গল। বড় বড় গাছের অবয়ব বোঝা যাচ্ছে।

– 'জানেন? এই পথে না পিশাচ আছে।'

আমি বিরক্ত হয়ে পাশের লোকটার দিকে তাকালাম। আধ বয়স্ক লোক। তবে সুপুরুষ। চোখের মাঝে এক ধরনের মায়া আছে। শুরু থেকেই লোকটা চেষ্টা করছেন আড্ডা জমাতে। কিন্তু কানে হেডফোন থাকায় সুবিধা করতে পারেননি। এবার সুযোগ পেয়েই ঢিল ছুড়েছেন। অবশ্য আমারও এখন সময় কাটানো দরকার। গান শুনতে আর ভালো লাগছে না। ঘুমাবো, তারও সায় পাচ্ছি না। বাস থেমে আছে, কখন কী হয়, ঠিক নেই। শুধু শুধু বোর হওয়ার থেকে তাই আড্ডা দেওয়াই ভালো বোধ হয়।

আমি বললাম– 'সত্য বলছেন? এখানে আসলেই পিশাচ আছে, আই মিন ভূত?'

– 'হুম!'

– 'তাই নাকি? ইন্টারেস্টিং তো! আপনি জানলেন কিভাবে?'

লোকটি গর্বভরে বললেন– 'এ পথে আমার প্রায়ই যাতায়াত হয়। সেভাবেই জেনেছি।'

– 'ও! আপনি কখনো দেখেছেন?'

– 'আরে ধুর! আমি দেখবো কোত্থেকে? ওসব তো লোকমুখে শোনা কাহিনী। বলতে পারেন লোককাহিনী।'

– 'আপনি বিশ্বাস করেন এসব?'

ভদ্রলোক হাই চাপতে চাপতে বললেন– 'আরে নাহ্! আপনি দেখছি মজার লোক। ওসব আমি বিশ্বাস করতে যাবো কেন? ওসব তো কুসংস্কার। তবে .... গভীরভাবে ভাবলে একটু খটকা লাগে।'

আমি বললাম– 'তাই? সেটা কী রকম?'

– 'প্রতি মাসেই এ রাস্তায় একটা না একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়। এবং আবশ্যকভাবে কয়েকজন জীবনও হারায়।'

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম– 'সে তো বাংলাদেশের সবখানেই হয়। প্রতিদিনই ঘটে কোথাও না কোথাও।'

ভদ্রলোক মুচকি হাসলেন। বললেন– 'এ জন্যই তো বললাম-কুসংস্কার। ওসব আমি বিশ্বাস করি না।'

এরপর কিছুক্ষণ কোনো কথা হলো না। হঠাৎ আমি বললাম– 'আচ্ছা থাকুন, আমি একটু ঘুরে আসি। বসে থাকতে আর ভালো লাগছে না।'

ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন– 'আরে! কোথায় যাচ্ছেন?'

– 'আপনার পিশাচটাকে নিজ চোখে দেখে আসি।'

লোকটি হা হা করে হাসতে লাগলেন। বললেন– 'আপনাকে গাড়ি থেকে নামতে দিলে তো! এতো রাতে ওরা আপনাকে গাড়ি থেকে একা ছেড়ে দেবে ভেবেছেন?'

আমি অবজ্ঞার হাসি হেসে পকেট থেকে অফিসের আইডি কার্ডটি বের করে দেখালাম। লোকটি পুরো থ বনে গেলেন। বললেন– 'আপনি সাংবাদিক? হা হা! এতক্ষণ তাহলে খালুর কাছে মামার বাড়ির গল্প করছিলাম? ভালো মজা তো!'

আমি মুচকি হেসে সিট থেকে উঠে আসছিলাম, ভদ্রলোক আমার হাত ধরে টান দিলেন। বললেন– 'দাঁড়ান! আমাকেও নিয়ে যান। আমিও ঘুরে আসি বাইরে থেকে। একা আমার ভালো লাগবে না।'

আমি ব্যাকপ্যাক'টা ঠিক করতে করতে বললাম– 'আসুন। আপনি এলে ভালোই লাগবে।'

বাইরে এসে দেখলাম, ড্রাইভার আর কন্ডাক্টর মশাই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছেন। হেল্পার ছোকড়াটা বাসের নিচে শুয়ে আছে। চাকা খুলছে। আমি বললাম– 'কতক্ষণ লাগবে ঠিক হতে?'

ড্রাইভার লোকটিকে কেন যেন বড় চিন্তিত মনে হলো। তিনি হতাশ গলায় বললেন– 'স্যার বোঝা যাচ্ছে না। ঘণ্টা দেড়েক লাগবে কমপক্ষে। ইঞ্জিনটাতেও একটু সমস্যা হয়েছে।'

আমি হাসলাম। অন্ধকারে আমার রহস্যময় হাসিটা কেউ দেখলো না।

বাসকে পিছনে ফেলে আমরা সামনে এগোচ্ছি। আমি আর সেই ভদ্রলোক। আগে মনে হয়েছিল, দু'পাশে ঘন জঙ্গল। কিন্তু এখন দেখছি, জঙ্গল অত ঘন না। গাছপালা যথেষ্ট হালকা। তবে গাছের পাতাগুলো ইয়া বড় বড়।

হালকা বাতাস বইছে। সেই বাতাসে হালকা শীত শীত অনুভব হচ্ছে। আমি ঘড়ির দিকে তাকালাম। সাড়ে বারোটা বাজে। আকাশে মেঘ। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদটা তাতে ঢাকা পড়ে আছে।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে এলাম। ভদ্রলোক হঠাৎ বলে উঠলেন– 'ভাই, অনেক তো এলাম। এবার চলেন ফেরা যাক। আমার যেন কেমন ভয় ভয় করছে।'

আমি হো হো করে হেসে উঠলাম। বললাম– 'আপনি নাকি কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন না?'

তিনি বললেন– 'আসলে তা না! পরিবেশটা যেন কেমন ছমছমে। শীতের কাপড় নিয়ে আসা উচিত ছিল। বাতাসে ঠাণ্ডা লাগছে।'

আমি এবার টান দিয়ে আমার জ্যাকেটটা খুলে ফেললাম। স্যান্ডো গেঞ্জির আড়ালে গায়ের পশমগুলো আমার বাতাসে উড়তে লাগলো। বললাম– 'এই নিন, পরুন।'

ভদ্রলোক অবাক হয়ে তাকালেন আমার দিকে।

ততক্ষণে মেঘ সরে গিয়ে জ্যোৎস্নায় ভরে উঠেছে চারদিক। চাঁদের আলোয় আমার বিকট ছায়া গিয়ে পড়েছে দূরে। সেই ছায়া কোনো মানুষের নয়। অচেনা কোনো বন্য পশুর। আজ সে বহুদিন পর শিকার পেয়েছে। রক্তের নেশায় বুঁদ হয়ে বুক চাপড়াচ্ছে।

কিন্তু সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটির তাতে কোনো ভাবান্তর নেই। তার অপলক দৃষ্টি বড় অবাক হয়ে দেখছে পিশাচ রূপধারী আমাকে।

বাবা আমার

ফরিদ সাইদ

বাবা আমার মুক্ত আকাশ
নির্ভরতার চাদর
জীবন জুড়ে আপন মনে
করেন শুধু আদর ।

বাবার হাতে হাতটি ধরে
হাঁটা-হাঁটি শেখা
বাবার কাঁধে-কোলে চড়ে
এই পৃথিবী দেখা ।

লেখা-পড়ার হাতেখড়ি
বাবার কাছে শুরু
সারাজীবন বাবা আমার
আসল শিক্ষাগুরু ।

ন্যায়ের পথের জ্ঞানের আলো
বিপদকালের ছায়া
বাবা আমার আদর-শাসন
নিখাদ মনের মায়া ।

ছন্দ

আনিকা তাবাসসুম তাসফিয়া

ছন্দ তুমি মন্দ ভীষণ
দাও না কেন ধরা?
তোমায় ভেবে মনটা আমার
হয় যে দিশেহারা ।

ছন্দ তোমার বন্ধ দুয়ার
দাও না কেন খুলে?
মিষ্টি ছন্দে গাঁথব মালা
শিউলি, বকুল ফুলে ।

ছন্দ তোমার দ্বন্দ্ব ভুলে
বাসবে আমায় ভালো?
তোমায় নিয়ে লিখব ছড়া
ছড়িয়ে দেবো আলো ।

ক্লাস এবং মিটিং এখন জুম অ্যাপে

শরীফ তাজওয়ার

ক্লাস মানেই সারি সারি বেঞ্চে বসে থাকবে ছাত্ররা। সামনে এসে লেকচার দেবেন একজন শিক্ষক। আর মিটিং? গোল একটা টেবিলের চারপাশে বসা অনেকে। কেউ বলছে। কেউ শুনছে। সাধারণত এরকমই ছিল সব। কিন্তু বর্তমানে করোনাভাইরাসের (কোভিড-১৯) কারণে বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠান 'হোম অফিস বা ওয়ার্ক ফ্রম হোম' চালু করেছে। এ কারণে বাসা থেকেই করতে হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ সব কাজ। এমনকি মিটিংও সারতে হচ্ছে অনলাইনে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও ক্লাস নিচ্ছে এ মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে গত কয়েক দিনে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে জুম নামের

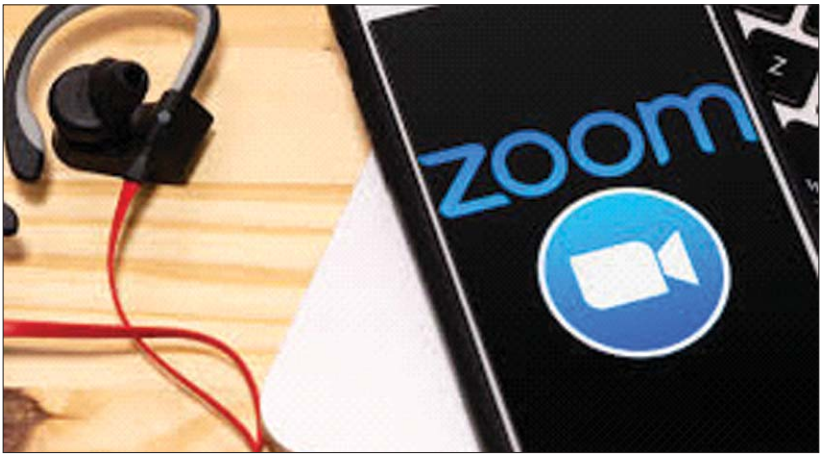

অ্যাপটি। এক প্রতিবেদনে জানা যায়– উইন্ডোজ, আইওএস ও অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেমের জন্য সমান কার্যকর জুম অ্যাপ। এর সাহায্যে মিটিং করা যাবে কোনও বাড়তি ঝামেলা ছাড়াই।

জুম অ্যাপে মিটিং করার জন্য শুরুতেই 'জুম ক্লাউড মিটিংস' নামের অ্যাপটি ডাউনলোড করতে হবে। অ্যাপ ডাউনলোডের সময় কিছুটা সতর্ক থাকতে হবে। কারণ, জুম নামের অনেক অ্যাপ রয়েছে। এগুলো দিয়ে অনেক ধরনের কাজ করা যায়। ক্লাস বা মিটিংয়ের জন্য যে অ্যাপটি সেটিই ডাউনলোড করতে হবে। জুম অ্যাপ ডাউনলোডের পর ইনস্টল প্রক্রিয়া শেষ হলে একটি অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। গুগল কিংবা ফেসবুক অ্যাকাউন্টের সাহায্যেও জুম অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবে। জুম অ্যাপে অ্যাকাউন্ট খোলার পর নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবে।

প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সাইন ইন বাটনে চাপ দাও। লগইন হওয়ার পর চারটি অপশন পাওয়া যাবে। এগুলো হলো– নিউ মিটিং, জয়েন, শিডিউল এবং শেয়ার স্ক্রিন। নিউ মিটিং অপশন থেকে মিটিং শুরু করতে পারবে। এই অপশন থেকে জুম আইডি, ইমেইল অ্যাড্রেস বা মিটিংয়ের নাম ব্যবহার করে যে কাউকে আমন্ত্রণ জানানো যাবে। জয়েন অপশনের মাধ্যমে অন্য কারও আমন্ত্রণে কোনও মিটিংয়ে যোগ দেওয়া যাবে। এ ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে মিটিং আইডি ও পাসওয়ার্ড। হোস্ট চাইলে পাসওয়ার্ড ছাড়াও মিটিংয়ে যোগ দেওয়া যাবে। মিটিংয়ের শিডিউলের জন্য শিডিউল অপশন ব্যবহার করতে হবে। অন্য দিকে প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে শেয়ার স্ক্রিন অপশন। মিটিং শেষ হলে নিচের ডান কোণে থাকা 'এন্ড মিটিং' অপশনে ক্লিক করতে হবে। এইতো জুম অ্যাপের আদ্যোপান্ত। বলতে গেলে পুরো পৃথিবী এখন জুমের দখলে।

ঝড়ের দিনে

জাহাঙ্গীর আলম

গ্রীষ্ম শেষে আমার দেশে
বর্ষাঋতু আসে,
আষাঢ় শ্রাবণ দু'টি মাসে
নদী-নালা ভাসে।

আকাশ পানে মেঘের ভেলা
ঝমঝমাঝম বৃষ্টি,
বৃষ্টির ফোঁটায় রূপের ঝলক
কাড়ে সবার দৃষ্টি।

ঝড়ের দিনে আম কুড়াতে
অনেক ভালো লাগে,
বৃষ্টির আভায় ছন্দ ছড়ায়
শৈশব স্মৃতি জাগে।

বৃষ্টি ভেজা জামাকাপড়
দেখতো যখন মায়ে,
দ্রুত বেগে শুকনো জামা
জড়ায় দিতো গায়ে!

শৈশব স্মৃতি মনের প্রীতি
ছন্দ তালে মাখা,
বর্ষাকালে প্রকৃতির সাজ
নতুন রূপে আঁকা।

পাবে সমাধান

আব্দুল্লাহ শাহজাহান

চিন্তা করো মহাবিশ্ব
কে করেছেন সৃষ্টি,
কার হুকুমে নুয়ে পড়ে
অঝোর ধারায় বৃষ্টি।

চিন্তা করো গ্রহ-তারা
চাঁদ-সুরুজকে নিয়ে,
কেন তারা দিবানিশি
যাচ্ছে আলো দিয়ে!

মন ছুটে যায় কোন সে টানে
কার অমন তাকিদে?
দিবানিশি কার টানে মন
যায় ছুটে মসজিদে?

চিন্তা করো তবে তুমি
পাবে তার সমাধান,
সকল কিছু যাঁর হুকুমে
তিনি আল্লাহ্ মহান।

রঙের সাথে মনের ভাব

আল জাবির

চারিদিকে নানা রকমের রঙ দেখে আমরা এতটাই অভ্যস্ত যে, আমাদের কার্যকলাপ ও আচরণের ওপর একেক রঙের যে একেক ধরনের প্রভাব আছে সেটা সঠিকভাবে লক্ষ করা হয়ে ওঠে না।

আমরা আমাদের পরিচ্ছদ ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের রঙের দ্বারা প্রভাবিত হই। একেকটি রঙ আমাদের শরীর ও মনের ওপর প্রভাব ফেলে। আজ আমরা জানবো বিভিন্ন রঙ সম্পর্কে। এসব রঙ কিভাবে আমাদের মনের ওপর প্রভাব ফেলে।

রঙের মধ্যে গোলাপি রঙটি অন্যতম। গোলাপি রঙটি মূলত ভালোবাসা, নম্রতা, প্রশান্তি, নির্দোষিতা, সহমর্মিতা, সংবেদনশীলতার সাথে জড়িত।

গোলাপি রঙ মানব প্রজাতির টিকে থাকা ও প্রতিপালনের প্রতিনিধিত্ব করে। উদ্বেগ ও রাগ কমিয়ে শরীরে প্রশান্তির অনুভূতি ছড়িয়ে দেয় এই রঙ। এমনকি আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব বায়োসোশ্যাল অ্যান্ড মেডিক্যাল রিসার্চের ড. অ্যালেকজান্ডার শাউস জানান যে, গোলাপি রঙের উপস্থিতিতে কোনো ব্যক্তি চাইলেও রাগান্বিত বা আগ্রাসী আচরণ করতে পারেন না। তার হৃদপেশিগুলো তখন দ্রুত স্পন্দিত হতে পারে না।

ক্রেতার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং তাদের প্রভাবিত করা, জনসমক্ষে বক্তৃতা বা কোনো প্রস্তাবনা পেশ করা, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে বেতন বাড়ানো বা

পদোন্নতি বিষয়ক আলোচনা- এসব সময়ে পরার জন্য গোলাপি রঙ বেছে নেওয়া যেতে পারে। এই রঙটিকে নারীসুলভ ভেবে অনেক পুরুষই এড়িয়ে চলতে চান। এমতাবস্থায় কোনো পুরুষ যদি গোলাপি রঙ পরেন, এটি তার নিজের ব্যক্তিত্বের প্রতি দৃঢ় আত্মবিশ্বাস ও সাহসিকতাকেই নির্দেশ করে।

ঘরে গোলাপির নানা ধরনের শেড ব্যবহার করে ভিন্ন ভিন্ন আবহ সৃষ্টি করা যেতে পারে। উজ্জ্বল গাঢ় গোলাপি যেখানে জমকালো ভাব ফুটিয়ে তোলে, সেখানে চাপা হালকা গোলাপি আবার শীতল, শান্তিদায়ক অনুভূতি ছড়ায়।

নিজের রুচি অনুসারে গোলাপির সঙ্গে গাঢ় নীল, বাদামি, কালো, সবুজ, সোনালি বা রুপালি রঙের সমন্বয় করে ঘর

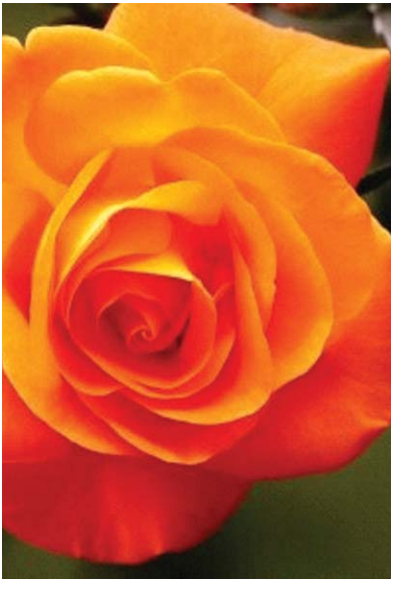

সাজানো যেতে পারে। শোবার ঘর, সাজঘর বা বাড়ির প্রবেশমুখে গোলাপি রঙ ব্যবহার করা যেতে পারে।

অবশ্য অতিরিক্ত গোলাপির ছড়াছড়ি শরীরের কর্মচাঞ্চল্য নিঃশেষ করে শরীরকে দুর্বল করে দিতে পারে।

নীল রঙ প্রশান্তি, শীতলতা, বিশ্বস্ততা, প্রজ্ঞা, সততা, আবেগশূন্যতা, বিরাগ, কেন্দ্রীভূত আচরণ প্রভৃতিকে নির্দেশ করে।

নীল রঙ মস্তিষ্কে এমন কিছু রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ করে যা মস্তিষ্ককে শান্ত রাখে। রক্তচাপ এবং হৃদস্পন্দনের হার কমাতে সাহায্য করে এটি।

হালকা নীল রঙ যেখানে আকাশের মতো বিশালতা ও প্রফুল্লতা প্রকাশ করে, সেখানে গাঢ় নীল আবার বিষণ্নতা বা গভীর বিষাদের অনুভূতি জাগায়।

নীল রঙ বিশ্বস্ততার পরিচয় বহন করে। তাই ফ্যাশন ডিজাইনাররা চাকরিপ্রার্থীদেরকে ইন্টারভিউতে নীল পোশাক পরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তা ছাড়া নীল রঙ স্থিতিশীলতারও প্রতীক।

১৯৯৯ সালে ক্রেইটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা দেখেন যে, কর্মক্ষেত্রে নীল রঙের ব্যবহার কর্মীদের মধ্যে শান্ত, নিবিষ্ট এবং আশাবাদী মনোভাব তৈরি করে, যা তাদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক।

তাই কর্মক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য নীল রঙ বেশ উপযোগী। বাড়িতে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বসার ঘরে নীল রঙ না দেওয়াই ভালো। কারণ এটি মানুষের পারস্পরিক

যোগাযোগ বা আলাপচারিতা করার ইচ্ছাকে বাধা দেয়।

তবে যেহেতু নীল রঙ স্নায়ু শিথিল করে, সুতরাং শোবার ঘরে নীল রঙ ভালো ঘুমের জন্য সহায়ক হতে পারে। নীল রঙ ক্ষুধা কমিয়ে দেয়।

গবেষণায় দেখা গেছে, মানুষ লাল বা হলুদ রঙের ঘরের তুলনায় নীল রঙের ঘরে খাবার খেলে তিনগুণ কম ক্যালরি গ্রহণ করে। সুতরাং, যারা ওজন কমাতে ইচ্ছুক, তারা চাইলে তৈজসপত্র ও খাওয়ার ঘরে নীল রঙ প্রয়োগ করতে পারেন।

লাল রঙ সাধারণত ভালোবাসা, স্নেহময়তা, শক্তি, উত্তেজনা, সতেজতা এবং তীব্র আবেগ নির্দেশ করে।

এটি শরীরের অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি এবং স্নায়ুকোষকে উদ্দীপ্ত করে। হৃদস্পন্দন ও শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বৃদ্ধি করে। শরীরের ফাইট অর ফ্লাইট রেসপন্সকে সক্রিয় করে তুলতে পারে।

লাল রঙের শক্তিদায়ক বৈশিষ্ট্যের কারণে হাঁটা বা ব্যায়ামের সময়ে পরার জন্য এ রঙ উপযোগী। কারো মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্যও লাল একটি আদর্শ রঙ।

এই রঙের তীব্রতার কারণে আপস, মীমাংসা বা মতবিরোধ জাতীয় আলোচনার সময় লাল রঙ এড়িয়ে যেতে পারলেই ভালো।

লাল রঙ ঘরে প্রাণবন্ত আবহের সৃষ্টি করে। বসার ঘরে লাল রঙের ব্যবহারের ফলে সবাই একত্রিত হয়ে পারস্পরিক যোগাযোগের উপযুক্ত আবহ সৃষ্টি হয়।

এই রঙ ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, তাই খাওয়ার ঘরের জন্য বেশ উপযোগী। এ ছাড়া ঘরের প্রবেশমুখে লাল রঙের ব্যবহার অতিথির মনে গভীর ছাপ ফেলে।

তবে এ রঙ মেজাজকে প্রতিকূল ভাবাপন্ন ও খিটখিটে করে তুলতে পারে, তাই শিশুদের ঘরের জন্য এটি উপযুক্ত নয়। খুব বেশি লাল রঙের মাঝে থাকলে তা মানসিক চাপ, হতাশা ও রাগের কারণ হতে পারে।

হলুদ খুশি, আনন্দ, উচ্ছলতা, স্নেহময়তা, আশাবাদিতা, তীব্র আবেগ, ক্ষুধা, হতাশা এবং রাগ প্রকাশ করে।

হলুদ রঙ মস্তিষ্কে সেরোটোনিন নিঃসরণের হার বৃদ্ধি করে, যা মনে সুখের অনুভূতি তৈরি করে। বলা হয়ে থাকে, এই কারণেই ইমোজি হলুদ রঙের হয়ে থাকে। উজ্জ্বল সূর্যালোকের মতই হলুদ রঙ আমাদেরকে উজ্জীবিত করে তোলে, আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়, আশাবাদী মনোভাবের সৃষ্টি করে।

হলুদ রঙের ঘরে উষ্ণ বোধ হয়, তাই বাড়ির উত্তরমুখী ঘরে এ রঙটি ব্যবহার করা যেতে পারে। এ রঙ ক্ষুধা ও বিপাকক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি করে, সুতরাং খাওয়ার ঘরে প্রয়োগের জন্য হলুদ রঙ বেশ উপযোগী। যেহেতু এ রঙটি কর্মচাঞ্চল্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সেহেতু যেসব ঘরে বিশ্রাম নেওয়া হয় সেসব ঘরে এ রঙ মানানসই নয়।

মস্তিষ্কের যে অংশটি উদ্বেগ সৃষ্টির জন্য দায়ী, হলুদ রঙ সেই অংশটিকে সক্রিয় করে তোলে। ফলে মেজাজ বিগড়ে গিয়ে ঝগড়ার সূচনা হতে পারে এ

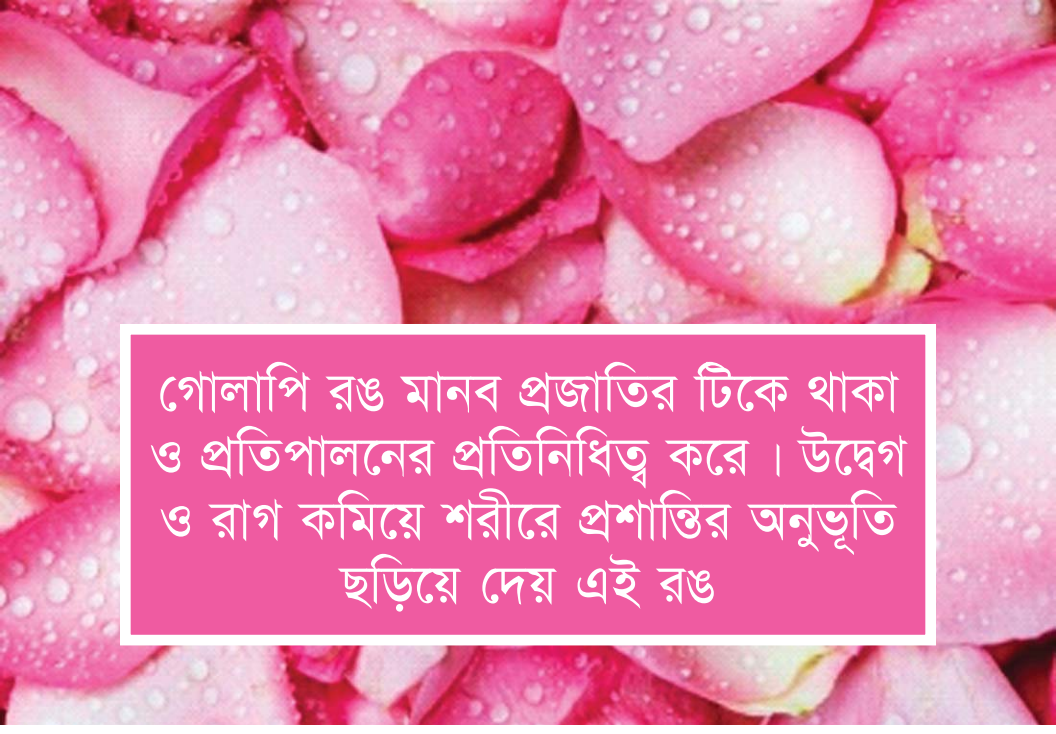

গোলাপি রঙ মানব প্রজাতির টিকে থাকা ও প্রতিপালনের প্রতিনিধিত্ব করে। উদ্বেগ ও রাগ কমিয়ে শরীরে প্রশান্তির অনুভূতি ছড়িয়ে দেয় এই রঙ

রঙ দেখলে। এমনকি হলুদ রঙের ঘরে শিশুদেরও কান্না করার প্রবণতা বেশি থাকে। এ রঙের অতিরিক্ত ব্যবহারে ক্লান্তি বোধ হতে পারে।

কমলা আনন্দ, উত্তেজনা, উদ্দীপনা, উদ্ভাবনক্ষমতা, সক্রিয়তা, সহিষ্ণুতা, স্নেহময়তা, সম্পদ, উন্নতি ও পরিবর্তনের পরিচয় বহন করে।

কমলা রঙটিতে লালের তীব্র আবেগ আর হলুদের আনন্দের সম্মিলন ঘটেছে। গবেষণায় দেখা গেছে, এটি মস্তিষ্কে অক্সিজেনের সরবরাহ বৃদ্ধি করে, মনোযোগ বাড়ায় এবং স্নায়ুগুলোকে চাঙ্গা করে তোলে। এটি মানুষের আগ্রহ ও সৃজনশীলতাকে উদ্দীপ্ত করে।

কমলা রঙ মানসিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করে, তাই সৃজনশীল কোনো কাজ, যেখানে মাথা খাটিয়ে প্রচুর উদ্ভাবন করতে হবে, সেসব ক্ষেত্রে পোশাক বা অনুষঙ্গে কমলা রঙের উপস্থিতি থাকা ভালো। এ ছাড়া এই রঙটি শরীরকেও শক্তি দেয়, তাই ব্যায়াম বা জগিংয়ের সময়ও এটি পরা যেতে পারে।

হলুদের মতো এটিও বাড়ির উত্তর দিকের ঘরগুলোতে ব্যবহার করা যেতে পারে। শোবার ঘরে এর ব্যবহার না করাই ভালো। ক্ষুধা ও বিপাক ক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি করে বিধায় খাওয়ার ঘরে ব্যবহারের জন্য এ রঙটি বেশ উপযুক্ত। ঠিক একই কারণে ফাস্ট ফুডের দোকানগুলোর বেশির ভাগেরই লোগো লাল বা কমলা রঙের করা হয়। আবার অতিরিক্ত কমলা রঙের উপস্থিতিতে ক্লান্তি বোধ হতে পারে।

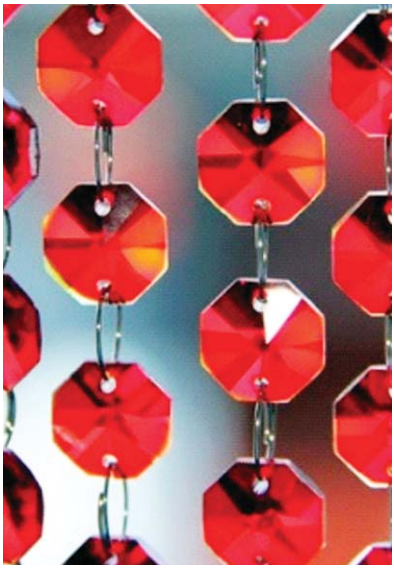

সবুজ রঙ প্রকৃতি, শান্তি, শীতলতা, উন্নতি, স্বাস্থ্য, উর্বরতা, অর্থ, অসুস্থতা ও ঈর্ষার প্রতীক।

সবুজ রঙ চোখের জন্য সবচেয়ে আরামদায়ক ও সহজ, কারণ এ রঙটি দেখার জন্য কোনো চোখে বাড়তি কোনো চাপ পড়ে না। তা ছাড়া গবেষকগণ প্রমাণ করেছেন যে, সবুজ রঙ দৃষ্টিশক্তিরও উন্নতি ঘটায়। এটি ক্লান্তি ও মানসিক চাপ দূর করতে সাহায্য করে। সুতরাং কর্মস্থলে যাদেরকে লম্বা সময় ধরে কম্পিউটার স্ক্রিনের সামনে বসে কাজ করতে হয়, তারা সবুজ রঙের ডেস্কটপ ব্যাকগ্রাউন্ড রাখতে পারেন। এতে চোখের ওপর চাপ কম পড়বে এবং চোখের আরাম হবে।

একেক পরিস্থিতিতে একেক মাত্রার সবুজ রঙ মানানসই। ক্যাজুয়াল কোনো সাক্ষাতে গেলে বা সামাজিক অনুষ্ঠানে উজ্জ্বল সবুজ পরা যেতে পারে। সংঘাতময় পরিস্থিতির সমাধানের সময় চাপা সবুজ রঙ উপযোগী। কিন্তু আবার কোনো দলের নেতৃত্ব দেওয়ার সময় বা জনসমক্ষে বক্তব্য দিতে গেলে চাপা সবুজ তেমন জুতসই নয়।

দেখা গেছে, সবুজ রঙের অফিসে যারা কাজ করেন, তারা তাদের চাকরি নিয়ে বেশি পরিতৃপ্ত বোধ করেন। এ ছাড়াও এ রঙ উদ্বেগ কমায় এবং এটি অর্থের সঙ্গেও জড়িত। তাই কর্মস্থলে ব্যবহারের জন্য সবুজ রঙটি বেশ উপযুক্ত।

বাড়িতে শোবার ঘর, গোসল ঘর এবং পড়ার ঘরে এই রঙ প্রয়োগ করা যেতে পারে। এ ছাড়া ঘরে ইনডোর প্ল্যান্ট ব্যবহার করেও আনতে পারেন সবুজের সতেজতা।

সাধারণভাবে সবুজ রঙ সতেজতার প্রতীক হলেও জলপাই সবুজ রঙটির মধ্যে কেমন যেন বিষণ্নতার আভাস পাওয়া যায়। আবার চাপা সবুজ চোখে যেমন আরামদায়ক অনুভূতি দেয়, উজ্জ্বল হলদে-সবুজ বা টিয়া রঙ তেমন স্বস্তিদায়ক মনে না-ও হতে পারে।

সাদা রঙ শুদ্ধতা, পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, সরলতা, নির্দোষিতা, নিরপেক্ষতা, অজ্ঞতা, শূন্যতা ও দূরত্বের প্রতীক। কোনো কোনো সংস্কৃতিতে এটিকে শোকের প্রতীক বলেও ধরা হয়।

শিশুদের ব্যবহার্য অধিকাংশ সামগ্রীতে তাদের সরলতার প্রতীক হিসেবে সাদা রঙের উপস্থিতি থাকে। আবার

চিকিৎসকদের সাদা রঙ ব্যবহার তাদের পরিচ্ছন্নতা নির্দেশ করে। উপলক্ষ বুঝে সঠিক কাপড় ও নকশা নির্বাচন করতে পারলে সাদা রঙ অফিস থেকে শুরু করে বিয়ের অনুষ্ঠান, সবখানেই পরার উপযোগী হতে পারে।

সাদার ওপরে কোনো ময়লা বা দাগ পড়লে তা সহজেই চোখে পড়ে এবং তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করে নেওয়া যায় বলে সাধারণত রান্নাঘর ও স্নানঘরে এই রঙের ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। সাদা রঙ আলোর সব ক'টি রঙকে প্রতিফলিত করে, তাই যেকোনো ঘরকে বড় এবং উজ্জ্বল দেখাতে সাদা রঙ ব্যবহার করা যায়। যেকোনো চিত্রকর্ম, দেয়ালে সাজানোর শো-পিস প্রভৃতি সাদা রঙের পটভূমিতে ভালোভাবে ফুটে ওঠে।

কালো রঙ স্বচ্ছতা ও অকপটতার প্রতীক। এই রঙ কর্তৃত্ব, ক্ষমতা, শক্তি, বুদ্ধি, নিরাপত্তা এবং কোনো কোনো সংস্কৃতিতে দুর্দশা, মৃত্যু বা শোকের চিহ্ন বহন করে।

এটি প্রতিরক্ষা বা প্রতিবন্ধকতার অনুভূতি তৈরি করে। আলোর সবটুকু শোষণ করে নেয় বলে এই রঙ ক্ষেত্রবিশেষে ভয় ও প্রচ্ছন্নতার ভাব জাগিয়ে তোলে।

কালো রঙ প্রায়শই আগ্রাসী মনোভাব তৈরি করতে পারে। গবেষকরা ৫২,০০০ এরও বেশি জাতীয় হকি লিগ গেমসের পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে দেখেছেন যে, যেসব দল তাদের আগ্রাসী ব্যবহারের কারণে দণ্ডিত হয়েছে, তারা অধিকাংশই কালো জার্সি পরা দল ছিল। পরবর্তীতে

জার্সির রঙ পরিবর্তনের পর তাদের আচরণেও ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

কালো পোশাক শরীরকে চিকন দেখাতে সাহায্য করে। পাশাপাশি আনুষ্ঠানিক পরিবেশে মার্জিত ও পরিপাটি দেখানোর জন্য এ রঙ বেশ উপযোগী। কখনো আবার কালো পোশাক পরিহিত ব্যক্তিকে নির্লিপ্ত ও অশুভ বলে মনে হতে পারে।

কালো রঙের সাথে যেকোনো রঙের উজ্জ্বল বা চাপা- উভয় ধরনের শেড চমৎকারভাবে মানিয়ে যায়। কালো পটভূমির ওপর বিভিন্ন রঙের অনুষঙ্গ সাজিয়ে ঘরকে আকর্ষণীয় করে তোলা যেতে পারে। সাদা ও সোনালি রঙের সাথে কালো রঙের সমন্বয় ঘরে এনে দেবে রাজকীয় আবহ।

বর্ষা মানে

ছামির আলী ভূঁইয়া

বর্ষা মানে দিন দুপুরে
কদম ফুলের গন্ধ,
কবির মনে নতুন ছড়া
গান কবিতার ছন্দ ।

বর্ষা মানে হঠাৎ করে
টাপুর-টুপুর বৃষ্টি,
আকাশ জুড়ে মেঘে মেঘে
নেয় ছিনিয়ে দৃষ্টি ।

বর্ষা মানে রয় লুকিয়ে
লম্বা কালো সাপটা,
চুপটি করে ব্যাঙের দলে
হঠাৎ মারবে ঝাপ্টা ।

বর্ষা মানে মেঘের জলে
হঠাৎ পুকুর ভরবে,
চতুর্দিকে জলে জলে
শুধুই খেলা করবে ।

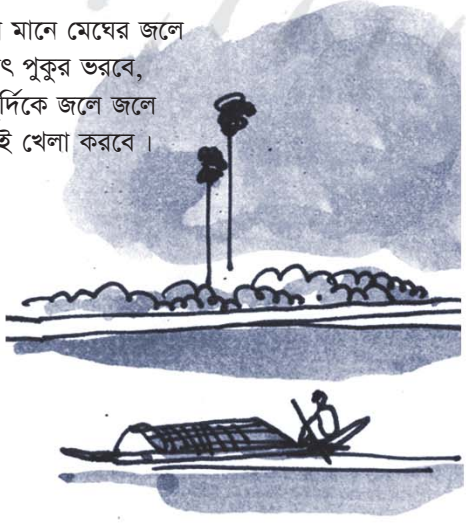

বৃষ্টি

আলামিন ইসলাম জীবন

মাঠঘাট খালবিল
নদী-নালা ডোবা ঝিল
সবই গেল ভেসে,
গাঁয়ের বুকে বৃষ্টি এলো
ঘরবাড়ি সব ডুবিয়ে দিলো
বৃষ্টি মোড়ল এসে ।

মোড়ল যেমন সব কেড়ে নেয়
গরিব দুঃখীর শেষ আশ্রয়
মিথ্যা মামলা করে,
ঠিক তেমনি বৃষ্টি এসে
রাক্ষুসে এক মোড়ল বেশে
দেশটা দিল জুড়ে ।

নির্ধারিত এ ফরম ছাড়া 'বলতে পারো'র উত্তর দেয়া যাবে না

উত্তরকারীর ঠিকানা

নাম : .....

বর্তমান ঠিকানা : .....

.....

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : .....

শ্রেণী : ..... বর্ষ/বিভাগ : ..... রোল : .....

ফোন : ..... থানা ও জেলা : .....

১. .....

২. .....

৩. .....

৪. .....

৫. .....

৬. .....

৭. .....

৮. .....

৯. .....

১০. .....

উত্তর পৌঁছানোর শেষ তারিখ ৩০ জুলাই ২০২০

নির্ধারিত এ ছক ছাড়া 'শব্দ ধাঁধা'র সমাধান গ্রহণ করা হবে না

সমাধানকারীর ঠিকানা

নাম : .....

বর্তমান ঠিকানা : .....

.....

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান : .....

শ্রেণী : ..... বর্ষ/বিভাগ : ..... রোল : .....

ফোন : ..... থানা ও জেলা : .....

জুলাই ২০২০ সংখ্যার সমাধান

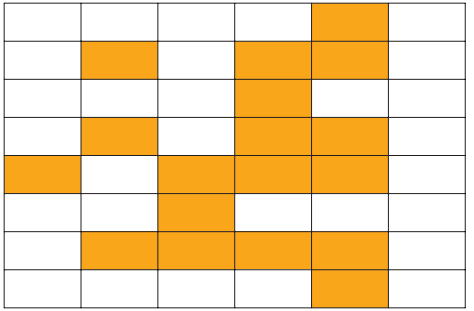

বলতে পারো এবং শব্দ ধাঁধার উত্তর মাঝে কেটে পাঠাও

সমাধান পৌঁছানোর শেষ তারিখ ৩০ জুলাই ২০২০

ছোটোদের ঈমান সিরিজ

বন্ধুরা! তোমরা নিশ্চয়ই গল্প শুনতে পছন্দ করো। তোমাদের জন্য থাকছে অসাধারণ ছয়টি গল্পের বই। এ-সবই সত্য গল্প। আশা করছি তোমরা এক নিমিষেই শেষ করে ফেলবে!

আল্লাহ আমার রব

ফেরেশতারা নূরের তৈরি

আসমান থেকে এলো কিতাব

দুনিয়ার বুকে নবি রাসূল

বিচার হবে আখিরাতে

তাকদীর আল্লাহর কাছে

‘ঈমান সিরিজ’ পেতে তোমাদের কাছের লাইব্রেরিতে খোঁজ করো

সমর্পণ
প্রকাশন
০১৭৭৯ ১৯ ৬৪ ১৯
০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪২